উৎস মানুষ

৩২ বর্ষ ● ৪র্থ সংখ্যা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১২

সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আমাদের কথা		
লাঞ্ছিতাদের দুর্বার দাবি		
মানবিক হোক	অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়	২
বারবণিতারা বলছি	আশা সাধুখাঁ	৬
কষ্টকল্পিত শেষের সেদিন	অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়	৮
ভেষজ ওষুধ	সুনীতিকুমার মণ্ডল	১২
বনবিহারী	সমীরকুমার ঘোষ	১৬
প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি	সন্দীপ সিংহ	১৮
ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা	গৌতম মিস্ত্রি	২১
এত ধর্মাচারী, তবু...	ষড়ানন পণ্ডা	২২
জলবায়ুর পরিবর্তন-প্রতিবেদন		২৪
সংগঠন সংবাদ		২৭
অঙ্কে কাঁচা বা পাকা	পুলক লাহিড়ী	২৮
পুস্তক পর্যালোচনা		৩০
গ্রীসে ঝড় (ছড়া)	অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩১

সম্পাদক - সমীরকুমার ঘোষ

রেজিস্টার্ড অফিস - বি ডি ৪৯৪ সল্টলেক,কলকাতা-৬৪

কার্যালয়
খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন
বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা-৭০০১৩৬
ফোন:
৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬
ওয়েবসাইট : www.utsamanush.com
ই-মেল- utsamanush1980@gmail.com

আমাদের কথা

সোনায় মরচে!

'ইফ গোল্ড রাস্টস হোয়াট দ্য আয়রন উইল ডু!' —সোনায় মরচে ধরলে কী দশা হবে! ক্যান্টারবেরি টেলস-এ নাকি এমন একটা মন্তব্য আছে। সত্যি তো, সোনায় মরচে ধরে না, ধরার কথাই নয়। কিন্তু কালে কালে কত কী হয়! আমাদের দেশেই বহু প্রাচীন লৌহস্তম্ভ সগৌরবে দাঁড়িয়ে থাকে —মরচে ছুঁতে পারে না। আর সোনায়? অন্তত এ দেশে, সোনায় শুধু মরচে কেন পচন ধরতেও পারে! গত ১৭ সেপ্টেম্বর মহা ঢক্কানিনাদ করে প্রকাশিত 'এবেলা' পত্রিকায় প্রকাশিত একটা ছোট্ট খবরের দিকে চোখ রাখলে সমস্ত বিষয়টা প্রাঞ্জল হবে। খবরের শিরোনাম —'সাঁইদর্শনে ইসরোর বিজ্ঞানী'। তাতে বলা হচ্ছে, 'শ্রীহরিকোটায় শততম সফল মহাকাশ অভিযানের পর শুক্রবার রাতে সিরডি গিয়ে সাঁইদর্শন করেন ইসকোর ডিরেক্টর এস বীররাঘবন। তাঁর কথায়,'প্রতিটি সফল উৎক্ষেপণের পর আমাদের উচিত তাঁর আশীর্বাদ নেওয়া। আমাদের কাজ আমরা করেছি। বাকিটা ঈশ্বরের।' এরপর বীরপুঙ্গমরাঘবনের উদ্দেশে সাধু সাধু, কেয়া বাত, বাহ্ উস্তাদ জাতীয় বিশেষণ উজাড় করে না দিলে ভক্তি বিজ্ঞানীর অপরাধ হবে! বীরজি মা-মাসিদের আঁচলে আরেক যুক্তির গেরো দিলেন। আমাদের মতো চুনোপুঁটিরা নাস্তিক্যের কথা বললে, গেরো খুলে তাঁরা 'মহা'বীর রাঘবনকে বের করে ঘায়েল করবেন!

এর পাশাপাশি আরেক 'সুখবরও' আছে। আমাদের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মার্কসবাদী নন, দেবদ্বিজে তাঁর অপার ভক্তি। ৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত 'বাস্তু মেনে মহাকরণে এবার মন্ত্রীদের ঘরেও 'পরিবর্তন'।' শীর্ষক এক খবরে জানা গেল শুধু মুখ্যমন্ত্রীরই নয়, অনেক মন্ত্রীর ঘরেই বদল হয়েছে বাস্তু মেনে। বোঝাই যাচ্ছে, কলিযুগে আর ঠাকুর-দেবতাকে ধরে কাজ হচ্ছে না!

গত কয়েক বছরের মতো এবারেও 'অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা'-র আয়োজন করা হয়েছে। ২৪ নভেম্বর, বিকেল ৫টায় বাংলা আকাদেমি সভাগৃহে 'এ উপমহাদেশে মেয়েরা কেমন আছে?' বিষয়ে বলবেন স্বাতী ভট্টাচার্য। উৎস মানুষের সমস্ত বন্ধু-স্বজনদের সাদর আমন্ত্রণ রইল।

আ হ র ণ

লাঞ্ছিতাদের ‘দুর্বার’ দাবি মানবিক হোক

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রস্টিটিউশন বা পতিতাবৃত্তিকে স্বীকৃত পেশা বা ব্যবসা হিসেবে আইনি বৈধতা দিতে হবে — এ দাবি উঠেছে সম্প্রতি, উঠেছে পশ্চিমবঙ্গের যৌনকর্মী মহল থেকে। সত্যি কথা বলতে কি, একজন সাধারণ বঙ্গদেশীয় মধ্যবিত্ত হিসেবে এরকম একটা দাবির কথা প্রথম শুনলে শিউরে উঠতে হয় — সে কি! বেশ্যাবৃত্তি আর পাঁচটা পেশার মত সমাজগ্রাহ্য হবে নাকি! ঘরের মা-বোন-মেয়েরা প্রকাশ্যে এই দেহব্যবসার লাইসেন্স পাবে? তাহলে সমাজ উচ্ছন্নে যেতে আর বাকি থাকে কি!

জানি, এই শিহরণ এই বিস্ময় আমাদের অন্তরের ঐতিহ্যলালিত সংস্কারের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। সমাজের সুস্থতা শুচিতা সৌন্দর্য সম্পর্কে যে ধারণা, যে মূল্যবোধ, প্রজন্ম পরম্পরায় আমাদের কালচারে রয়ে গেছে, সেখানে ধাক্কা লাগে; সর্বনাশের শঙ্কায় শঙ্কিত হই আমরা।

তবু ভাবতে হয়, বিচার করে দেখতে হয়। এবং সে বিচার যেমন সংস্কারমুক্ত খোলা মন নিয়ে করা দরকার, তেমনি সার্বিক যুক্তিনিষ্ঠ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিতে হওয়া দরকার, না হলে সত্যটাকে চেনা যায় না।

সমাজে বারবনিতাদের অবস্থান বহু প্রাচীনকাল থেকে। বলা হয়, পতিতাবৃত্তি সমাজের আদিমতম বৃত্তি। পুরুষের বিকৃত যৌনকামনা, অতৃপ্ত বাসনা, উচ্ছৃঙ্খলতা আর অবৈধ আশ্রয়ের প্রয়োজনেই বারবনিতাদের সমাজের অন্ধকারে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। ...তবু কালের প্রবাহমানতা অনেক আলোড়ন ঘটায়, অনেক পরিবর্তন বয়ে আনে, যেমন হয়েছে এই পতিতাকুলের ক্ষেত্রেও।

আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের কথাই ধরা যাক। কবে কিভাবে যৌনব্যবসার সূত্রপাত হয়েছিল জানার উপায় নেই। চলে এসেছে ক্রমবর্ধমান হারে, মূলত দারিদ্র, অসহায়তা, আর পুরুষের প্রবঞ্চনার হাত ধরে। কোনও রমণীই স্রেফ মজা-ফুর্তির জনা কিংবা তথাকথিত ‘দুশ্চরিত্রা’ হওয়ার কারণে বেশ্যাবৃত্তির লাইন-এ আসেনি। যদি বা কেউ বেহিসাবী প্রলোভনে কিংবা মিথ্যে আশ্বাসের ফাঁদে পড়ে এ ব্যবসার বৃত্তে চলে এসেছে, অচিরেই সে এই নির্দয় নরকবাস ছেড়ে পালাতে চেয়েছে, পারেনি। মালিক-মাসি-দালাল-মস্তানের চক্রব্যূহে আটকে পড়েছে।

ছোটবেলা থেকেই আমরা দেখে আসছি মুখে কড়া স্নো-পাউডার-সুর্মা-কাজল মেখে, উত্তেজক রঙচঙে পোশাকে সেজে, গলির মোড়ে পার্কের ধারে, আধো অন্ধকারে খদ্দের ধরার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে। ওরা বেশ্যা। আশৈশব জেনে এসেছি ওরা ঘৃণ্য, পাপিষ্ঠ, সমাজ তাড়িত। ওদের পল্লী নিষিদ্ধ — ভদ্রভাষায় ‘রেড লাইট এরিয়া’। অতএব সাধারণ সমাজের মমতা সহানুভূতি ওদের কখনই প্রাপ্য নয়; ওদের সখ-আহ্লাদ, চাহিদা, অধিকার, দাবি — কিছুই যেন নেই, থাকতে নেই।

রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা কোনও ছাড়, ভারতের আইন ‘বেশ্যবৃত্তি’কে কোনও রকম অনুকম্পা বা সহানুভূতি দেখায় নি। না দেওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করা হয়েছে আইনশাস্ত্রে। বলা হয়েছে, এই প্রাচীন পেশা সাধারণ বিশ্ববাসীর কাছে অবাঞ্ছিত, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদের ৪ ও ৫ নং ধারার প্রত্যক্ষ বিরোধী; এবং ভারতীয় সংবিধানের ২১ নং ধারার পরিপ্রেক্ষিতে কলঙ্কজনক। পতিতা-পেশার আইনি বাস্তবতা প্রসঙ্গে ১৯৯৭ সালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট এক রায়-এ বলেছেন, ‘‘পতিতাবৃত্তি এক মনুষ্যত্ব-বিরোধী অপরাধ, মানবাধিকারের লঙ্ঘন, ভারতীয় আইনের চোখে সমাজ-দূষণকারী এক পেশা। সংবিধানের ২৩ নং ধারা মোতাবেক কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে এই নিকৃষ্ট বৃত্তি বজায় থাকা অতি সংবেদনশীল একটি বিষয় — সমাজ থেকে এই পেশা নির্মূল করার সদিচ্ছা সরকারের থাকা উচিত।...’’ সরকার অদ্যাবধি কি পদক্ষেপ নিয়েছে? রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ‘পিটা’ আইন (Prevention of Immoral Traffic Act) লাগু করেছে। কাগজে-কলমে এই অ্যাক্টের উদ্দেশ্য হল বেশ্যাবৃত্তির মত অমানবিক ব্যবসাতে মেয়েদের ঢোকা বন্ধ করা, সমাজের ‘‘শুচিতা’’ রক্ষা করা। অথচ বড় মজার এ আইনের বাস্তব প্রয়োগ রীতি : রাস্তায় বা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে খরিদ্দার ধরার চেষ্টা করলে পুলিশ ধরবে, কিন্তু ঘরের ভেতর লুকিয়ে চুরিয়ে ভদ্রতার ভনিতা রেখে বেশ্যবৃত্তি চালালে সেটা ‘পিটা’ আইনের নাগালের বাইরে থাকবে। এই ব-কচ্ছপ মার্কা আইনি শাসনের বাস্তব চেহারাটা দাঁড়িয়েছে এই — ‘হতভাগ্য’ দরিদ্র মেয়েদের গণিকাবৃত্তিতে চলে

আসার মূল কারণকে দূর করা, দমন করা নিয়ে মাথাব্যথা নেই পুলিশ প্রশাসন আইন-নিয়ামক বা রাজনৈতিক কর্তাদের। বরং দেহ বিক্রির অবৈধ ব্যবসা চালু থাকলে কর্তাদের পোয়াবারো — পিটা প্রয়োগের নাম করে যখন তখন অরক্ষিত মেয়েদের তুলে নিয়ে যাওয়া, তোলা নেওয়া, যথেচ্ছ নারীদেহ ভোগ করা, অত্যাচার করা, তৎপর পুলিশী শাসনের পরিচিত চিত্র। অর্থাৎ ভারতীয় সংবিধানে যে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োগের উপদেশ সরকারের প্রতি রয়েছে, কার্যক্ষেত্রে সেগুলি মোটা রেক্সিন বাঁধানো আইনি কেতাবের ভেতরেই চাপার অক্ষরে বন্দী রয়ে গেছে।

'বেশ্যা', 'পতিতা', 'গণিকা', 'খানকি' ইত্যাদি নামকরণের মধ্যেই সমাজের চূড়ান্ত ঘৃণা প্রকাশ পায়। এইসব অসহায় নারীরাও যে রক্তমাংসের মানুষ, তাদেরও যে মন আছে, চোখের জল আছে, সে-বোধ সমাজে বিশেষ জায়গা পায় নি বহুকাল। পরিবর্তনের একটা বাতাস, বোধ করি, এ রাজ্যে আসতে শুরু করে সত্তর দশকের বৈপ্লবিক তুফানের অনুষঙ্গ হিসেবে। নতুন রাষ্ট্র নতুন সমাজ গঠনের স্বপ্নের জোয়ার সে সময় নিম্নবর্গের নিপীড়িত অবহেলিত মানুষকে মূলস্রোতের 'সভ্য ভদ্র' সমাজের অনেকটা কাছাকাছি এনেছিল। এবং সেই সময়, আশির দশকে, কাকতালীয়ভাবে বিশ্বজুড়ে এড্স (AIDS) রোগের আতঙ্ক ছড়িয়েছিল; রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে নানা দেশি-বিদেশি প্রকল্প দ্রুত সক্রিয় হয়েছিল; শুরু হয়েছিল এড্স সংক্রমণের অন্যতম উৎস বলে চিহ্নিত পতিতাপল্লীগুলির অন্দরমহলে গিয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের স্বাস্থ্যরক্ষার কর্মসূচী। এর ফলে অনিবার্যভাবে মনোযোগ পেয়েছিল এতকালের 'অচ্ছুৎ' দেহপসারিণীরা।

কালান্তক ব্যাধি এড্স-এর সঙ্গে এখন লড়াই-এ নেমেছে সারা বিশ্ব। আমাদের রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের গোড়াতে বিশেষ হেলদোল না থাকলেও 'জাতীয় এড্স নিয়ন্ত্রণ পরিষদ (NACO)', 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)', ইউনাইটেড কিংডাম ওভারসিজ ডেভেলাপমেন্ট এজেন্সি (UKODA, UNAIDS, USAID, CIDA, CCI)' ইত্যাদি সংস্থার বিপুল অর্থ সাহায্য আসতে থাকে এড্স প্রকল্পে, বিশ্বব্যাঙ্কের ছাড়পত্র নিয়ে। ১৯৯২ সালে দেশে এসেছিল ৩০ কোটি মার্কিন ডলার, ১৯৯৮ সালে ৩২ কোটি (১৪২৫ কোটি টাকা), পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনায়। এত টাকার ঢল, মৌমাছির মত উদ্যোগী সংস্থারা নামে-বেনামে এসে ভিড় করবে — এতে আর আশ্চর্যের কি আছে! রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের এত বড় প্রকল্প রূপায়ণের পরিকাঠামো নেই তাই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাদের (NGO) সুযোগ দেওয়া হয়। প্রথম দিকে, ৯০-এর গোড়ায়, তিন-চারটি সংস্থা কাজ করছিল, ৯৮ সালে ৮৮টি এন জি ও সরকার মারফৎ অর্থসাহায্য পেয়েছে। বর্তমানে এ সংখ্যা শতাধিক। গণিকাদের সচেতন করে তোলা, সাক্ষরতা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, হাতের কাজ, পল্লীর পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা, কন্ডোম ব্যবহারের উৎসাহ দান, 'নিষিদ্ধ পল্লী'র শিশুদের ও বড়দের প্রথা-বহির্ভূত শিক্ষা — এরকম বহুবিধ 'প্রজেক্ট' নিয়ে ভালরকম অর্থসাহায্য জোগাড় করে এন জি ও-রা। লক্ষ্য করার বিষয় হল, এত সব প্রকল্পের মধ্যে এড্স রোগীদের জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয়, কিংবা পতিতাবৃত্তির মূল কারণ দূরীকরণ নিয়ে কোনও প্রকল্প নেই।

এন জি ও-দের টাকা নিয়ে নয়ছয়, হিসেবে কারচুপি, রিপোর্ট তথ্য-বিকৃতি ইত্যাদি নিয়ে সমালোচনা যথেষ্ট শোনা যায়। তার সবটা না হলেও অনেকটাই হয়ত সত্যি। যেমন একটা উদাহরণ নেওয়া যাক : ১৯৯২-এর 'সোনাগাছি কন্ডোম প্রকল্পে'র কাজ আন্তর্জাতিক স্তরে প্রচার পায়; এই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে ১৯৯৬-এ এক বিদেশি অর্থসাহায্য পরিচালিত সমীক্ষার রিপোর্টে জানানো হয়, কোলকাতার নিষিদ্ধ পল্লীগুলিতে কন্ডোমের ব্যবহার ২.৭ সতাংশ থেকে বেড়ে ৮১.৭ শতাংশ হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এর প্রত্যক্ষ ফল পাওয়ার কথা — এইচ আই ভি সংক্রমণের কেস সেই অনুপাতে কম পাওয়ার কথা। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, কোলকাতার 'কেন্দ্রীয় হাইজিন ইনস্টিটিউট'-এর মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ এবং 'স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন'-এর ভাইরলজি বিভাগে আই সি এম আর-এর গবেষণা প্রকল্পের সমীক্ষায় দেখা যায় (মে ১৯৯৭) — এড্স-এর প্রকোপ কমার বদলে বেড়ে গেছে; সোনাগাছি, মুন্সিগঞ্জ, ওয়াটগঞ্জ, মেটেবুরুজের 'রেড লাইট এরিয়া'তে এড্স ভাইরাস বা এইচ আই ভি পজিটিভ কেস যথেষ্ট বেশি মাত্রায় ধরা পড়েছে, এবং যত বেশি নমুনা-রক্ত পরীক্ষিত হচ্ছে ততই বেশি সংখ্যার নমুনায় এড্স জীবাণু পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে, আগের কন্ডোম প্রকল্প সমীক্ষকদের দাবি করা পরিসংখ্যানে কিছু গোলমাল নেই তো!

অর্থের অবাধ যোগান এলেই তার হাত ধরে অনর্থ আসে। তাই কেচ্ছা কেলেঙ্কারি নিয়ে অনেক কথাই উঠবে। সে অন্য গল্প। আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে আসি।

গত পনের-কুড়ি বছরে পতিতাদের সামনে রেখে উঠে এসেছে বহু এন জি ও। বহু ডাক্তার, শিক্ষিত তরুণ-তরুণী চাকরি পেয়েছে, সরকারি-বেসরকারি কর্তাব্যক্তিরা ডলারের প্রসাদ হাত ভরে নিয়েছে, এদেশ-ওদেশ উড়ে বেড়ানোর সহজ সুযোগ মিলেছে, কাগজে টিভি-তে ছবি উঠেছে, প্রচার পাওয়া গেছে। আর ওরা? যাদের জন্যে এত প্রাপ্তি, সেই চিরলাঞ্ছিত পণ্য নারীরা কি পেয়েছে? ... সাধারণ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি সেই একই করুণ ছবি; রাস্তায় ময়দানে পার্কে স্টেশনে মধ্য-নিম্নবিত্ত "লাইনের" মেয়েদের ক্রমাগত সংখ্যা বৃদ্ধি — দারিদ্র, বেকারত্ব, রাষ্ট্রীয় বঞ্চনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে। অন্যদিকে 'এড্স প্রিভেনশন সোসাইটি' আর 'ন্যাকো'র পরিসংখ্যান বলছে : পশ্চিমবঙ্গে

এড্‌স রোগের প্রাদুর্ভাব বিপজ্জনকভাবে বাড়ছে, ৩৩.৩ শতাংশ হারে; ১৯৮৬ সালে এ রাজ্যে প্রথম এড্‌স রোগী ধরা পড়ে, তারপর থেকে আমাদের জনদরদী বাম জমানাতেই কালান্তক রোগটি বেড়ে চলেছে অবাধে। ২০০০ সালে পাওয়া গিয়েছিল ২২১ জন এড্‌স রোগী, ২০০৩-এ সে সংখ্যা হল ৬১১, আর এ বছরের (২০০৫) ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চিহ্নিত রোগী ২৩৯৭ জন। এই রোগ বিস্তারও হয়েছে প্রধানত ওই 'পতিতা' নারীদের শরীরেই। দুঃখের ধারাপাতে মুক্তির পরিবর্তে এটাই হয়েছে ওদের পাওনা।

তবু কিন্তু পেয়েছে ওরা অন্য এক ধন। বাইরের আবরণে বা অর্থের পরিমাপে নয়, পেয়েছে আপন চেতনার জগতে। গত দেড় দু'দশকের পতিতা-কেন্দ্রিক ছোট-বড় কর্মকাণ্ডগুলোর সুবাদেই ওরা অন্ধকার থেকে পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়ানোর সুযোগ পেয়েছে; 'বেশ্যা' নামক ঘৃণিত পরিচয়ের জায়গায় 'যৌনকর্মী' নাম পেয়েছে, 'মানুষ' হিসেবে কিছু মর্যাদাবোধ খুঁজে পেয়েছে; নিজেদের সন্তানদের বাঁচার কথা, অধিকারের কথা, চাহিদার কথা বলার জোর সঞ্চিত করতে পেরেছে ওদের অনেকেই।

প্রথম যে বড় পরিবর্তনটা এল ৮০-র মাঝামাঝি সেটা হল আত্মনির্ভরতার প্রত্যয়। এতদিন এন জি ও-র স্যার, ভদ্রলোক দাদা-দিমিমিণি-দের পেছন পেছন ঘুরে পল্লীর কর্মী মেয়েরা রোগ ছড়ানোর কারণগুলো জেনেছে, সাথীদের কন্ডোম সচেতন করেছে, পাড়ার ভেতরে স্বাস্থ্য-ক্লিনিক পাঠশালা চালাতে এন জি ও-দের সাহায্য করেছে। তবু নিজেদের নিরাপত্তা পাচ্ছিল না তারা। দালাল-মাসি-মস্তান-পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে টক্কর দেওয়া যাচ্ছিল না। বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদে আরও বেশি মারধোর জুলুম হচ্ছিল। এরকম সময় এক কাণ্ড ঘটিয়ে ফেলল শেঠ গলির মেয়েরা : সাহসী কয়েকজন মেয়ে মিলে সেদিন শেঠ গলি-র কুখ্যাত 'ল্যাংড়া মস্তান'কে বেধড়ক ঠ্যাঙাল সবার সামনে। উল্টে প্রচুর মার খেল, রক্তারক্তি হল বটে, কিন্তু সেই প্রথম ওখানে মস্তানরাজ থমকাল। গলির মেয়েরা নতুন জোর পেল। গড়ে উঠল যৌনকর্মীদের প্রথম একান্ত নিজস্ত সংগঠন 'মাহলা সংঘ', ১৯৮৭ সালে।

মুক মুখে ভাষা, বাসনা, এবং দাবি-দাওয়া

'উৎস মানুষ' পত্রিকার মার্চ ১৯৯৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল মহিলা সংঘের সচিব আশা সাধুখাঁ-র খোলা চিঠি : "সাদা কথায় আমরা বেশ্যা। ভদ্রবাবুদের ভাষায় পতিতা। ... শুনছি (আমাদের নাম করে) কোটি কোটি টাকা আসছে দেশ-বিদেশ থেকে। টাকা মানেই ব্যবসা। তবে মা-বোনেরা এটা নিশ্চয়ই মানবেন আপনাদের ভাঙিয়ে কেউ ব্যবসা চালালে সেটা আপনারও ভাল লাগবে না। ... আমাদের সব গেছে, এখন একটাই স্বপ্ন ... আমাদের বাচ্চারা যাতে মানুষ হয়, তাদের যেন কোনওদিন এ পেশায় জড়িয়ে পড়তে না হয়।"

এর মধ্যে মহিলা সংঘের ভেতরে কিছু ভাঙাগড়া হল। তৈরি হল যৌনকর্মীদের 'মহিলা সমন্বয় কমিটি'। ১৯৯৬-এর এপ্রিলে সমন্বয় কমিটি কোলকাতায় তাদের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের আয়োজন করে। বিভিন্ন জেলার, অন্য রাজ্যের, এবং বিদেশেরও কিছু যৌনকর্মী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, ছিলেন 'ভদ্র' সমাজের 'মান্য' জনেরা। সেখানে কমিটির পক্ষ থেকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবি ওঠে। প্রশ্ন তোলা হয় —নারী নির্যাতনকারী 'পিটা' আইন বাতিল করা হবে না কেন? এই অমানবিক পেশা সমাজ থেকে দূর করার লড়াইতে তথাকথিত ভদ্র সমাজ কি সামিল হবে? ঘোষণা করা হয় —"আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে আমরা চাইছি যৌনকর্মী পরিচালিত একটি স্বশাসিত বোর্ড, যে বোর্ড মেয়েদের এ পেশায় ঢোকা, যৌন ব্যবসার নিয়মনীতি এবং যৌনকর্মীদের সার্বিক উন্নয়নের কাজ নিয়ন্ত্রণ করবে।"

এর আগে ১৯৯১ সালের এপ্রিলে, আমরা চমকিত হয়েছিলাম নিম্মি বাই-এর খবর জেনে। ভারতের ইতিহাসে প্রথম সে ঘটনা। পেশায় 'বেশ্যা' নিম্মি বাই দিল্লির চাঁদনি চক কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছিলেন ১০ম লোকসভা নির্বাচনে। নির্বাচনী প্রচারে নিম্মির দলের দাবিগুলো ছিল— পতিতাদের সন্তানদের বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ চাই, চাই বৃদ্ধ বয়সে বাসস্থান ও নিরাপত্তা, মাতৃ পরিচয়ে শিশুর পরিচয় বৈধ করা চাই। 'বেশ্যাবৃত্তি' টিকিয়ে রাখার কোনও দাবি সেদিনও উচ্চারিত হয়নি।

হল ১৯৯৭-এর নভেম্বর মাসে, কোলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে। সোনাগাছি-কেন্দ্রিক যৌনকর্মীদের জোরদার সংগঠন 'দুর্বার মহিলা সমন্বয় কমিটি' আয়োজন করেছিল সেই সাড়ম্বর ব্যয়বহুল 'যৌনকর্মীদের প্রথম জাতীয় সম্মেলন।' দেশ-বিদেশের মোট ৩০০০ স্বঘোষিত যৌনকর্মী, আমন্ত্রিত শিল্পী, কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার, রাজনীতিক, সাংবাদিক, টিভি-রেডিও-ভিডিও টেলিক্যামেরা, আর ঝকমকে আধুনিকা স্বেচ্ছাসেবী কর্মীদের নিয়ে চোখ ধাঁধানো বর্ণাঢ্য জমায়েত। গণিকাবৃত্তির অমানুষিক যৌনলাঞ্ছনা অবসানের জন্যে নয়, বিকল্প সুস্থ পেশা বা সামাজিক পুনর্বাসনের রাস্তা খোঁজার জন্যেও নয়, এ সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অভিনব দাবিকে সামনে তুলে আনা —"যৌনকর্ম একটা 'কাজ', এ কাজের আইনী স্বীকৃতি চাই, যৌনকর্মীদের শ্রমিকের অধিকার দিতে হবে।"

এ কেমনধারা দাবি?

ধাক্কা সামলাতে সময় লাগে। পুরুষের ভোগ-লালসার প্রয়োজনে নারীর চরম অমর্যাদা যে পেশার চরিত্র, অসহায় রমণীর দেহকে টাকা দিয়ে সুলভ পণ্য হিসেবে কিনে নেওয়া যায় যে পেশায়, সেই পেশাকে নির্মূল করার লড়াই সংগঠিত না করে

তাকে টিকিয়ে রাখা? তাকেই একজন শ্রমিকের কাজের সমতুল্য করার আয়োজন? কতখানি সমর্থনের যোগ্য এই দাবি? বিভ্রান্তি আসে। আর, এই বিভ্রান্তি আসে বলেই সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর সুযোগও আসে।

ইদানীং দেখনদারি সুবিধাবাদী কালচারের বেশ বাড় বাড়ন্ত। বর্তমানের অনেক নামডাক-ওলা কবি শিল্পী সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের অবস্থান বেশ কুশলী, পাঁকাল মাছের মত। মানি, মিডিয়া, সম্বর্ধনা, উপঢৌকন দিয়ে এনাদের হাসি-হাসি মুখে মঞ্চে বসানো যায়। ফরমায়েস মাফিক বাহবা টাহবা দিয়ে কাজ সারেন এঁরা। তারপর সুরুৎ করে জনান্তিকে চলে যাওয়া, মুখে কুলুপ আঁটা।... এই পরিস্থিতিতে 'দুর্বার'-এর পরিচালকরা পশ্চিমবঙ্গের বেশ কিছু 'খ্যাতনামা'র সার্টিফিকেট পেয়ে গেছেন। যেমন, গত ২৭ ফেব্রুয়ারি (২০০৫) বাংলায় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিকে কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার প্রচুর আবেগ-মাখানো কথনে সহনুভূতি ঢেলে দিলেন উদার-চিত্তে; কোনও সার্বিক ভালমন্দ নিয়ে বিশ্লেষণ নেই, সমাজ-সংস্কৃতির সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া নিয়ে কোনও অভিমত নেই। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের নৈতিক দায়িত্বের এই বহর দেখলে রীতিমত দুশ্চিন্তা হয়।

তবে সবটাই এরকম জেগে ঘুমনোর চিত্র নয়। খোলা মনে সোজা কথাটা বলে দেওয়ার মত 'কণ্ঠ' এখনও শোনা যায়, এটাই ভরসা।... ১৯৯৭-এ 'জাতীয় যৌনকর্মী সম্মেলনে' সেই সাড়া জাগানো দাবিটি উত্থাপিত এবং মিডিয়া প্রচারিত হওয়ার পরই প্রখ্যাত সমাজকর্মী রামী ছাবরা ৮ জানুয়ারি ১৯৯৮ 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় লিখলেন —"একজন বারবণিতার পেশাকে সাধারণ ব্যবসার বৈধতা দেওয়ার অর্থ আইন ও মনুষ্যত্বের মর্যাদার লঙ্ঘন। অন্ধকার জগতের পেশায় লিপ্ত থাকলেও একজন পতিতার নাগরিক হিসেবে মানবিক অধিকার থাকে : তাহলে, মানব-অবনমন আর মানবাধিকার কি একসঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলবে? কেন এই বিষয়টি জনসাধারণের কাছে বিতর্কের জন্য উন্মুক্ত হবে না! 'পাপী' নয় 'পাপ'-কে প্রতিহত করাই প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত নয় কি?" ১ এপ্রিল ২০০১ আনন্দবাজারে বাণী বসু লিখলেন —"এঁদের দাবির সপক্ষে বলা হচ্ছে বারবধূরা নাকি একটা পরিষেবা দিচ্ছেন। কিছু অস্বাভাবিক পুরুষ নিজ স্বার্থে এঁদের যৌনদাসী করে রেখেছে, এরই নাম পরিষেবা? কি ভয়ঙ্কর কথা! ...মান্যগণ্যরা দেখলাম মঞ্চে বসে বললেন, কাজটি নাকি নৈতিক। এঁদের পেশাটি নৈতিক হলে পুরুষের অনাচারটিও নৈতিক হয়। নারীমাংস ব্যবসাটিও অনৈতিক থাকছে না আর। এই মান্যগণ্যরা মধ্যযুগের নারীমাংস-হাটে ফিরে যেতে চাইছেন। মানুষ মানুষকে পণ্য করছে, এটা মনুষ্যত্বের অপমান নয়?" ...গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৫, ৭নং রাউডন স্ট্রিটে যৌনকর্মীদের দাবি নিয়ে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে তসলিমা নাসরিন 'দুর্বার'-এর কর্তাব্যক্তি ও নেত্রীদের সরাসরি বললেন —পতিতাবৃত্তিকে যৌনকর্ম বলুন আর 'কাজ'ই, এ তো পুরুষতন্ত্রের কদর্য প্রতীক। পুরুষের আরাম আয়েশ আহ্লাদ মেটানোর জন্য, পুরুষের ধর্ষকামের শিকার হওয়ার জন্য নারীকে নিয়োজিত করা। সামাজিক ও অসামাজিক বেশ্যা নিয়ে পুরুষতন্ত্রের ফূর্তিতে জীবন কাটানোর ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার দাবি করবেন আপনারা? আদিম অত্যাচারের অন্ধকারের বিরুদ্ধে লড়াই না করে টাকার বিনিময়ে এই পুরুষতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখায় সামিল হবেন? দাবিদার দুর্বার-এর কাছে এসব কথা পছন্দসই লাগেনি বোঝাই গেল; তাঁদের তিনজন মুখপাত্র এসেছিলেন সভায়। নিজেদের দাবি জোর গলায় পুনরাবৃত্তি করে চলে যান তাঁরা, কোনও বিতর্কে যাওয়ার সুযোগ না দিয়েই।

মুশকিল হল যৌনকর্মীদের ব্যক্তিগত মনের খবর প্রকাশ হয় না। বিভিন্ন সম্মেলন, সভা, সেমিনার, গণমাধ্যমে দুর্বার-এর প্রখর কর্মীবক্তারা, অদ্ভুতভাবে, ছকে বাঁধা কথা সর্বদা সর্বত্র একই সুরে বলে যান —"আমরা পরিষেবা দিচ্ছি। এটা একটা 'কাজ'। সমাজে বহু সাংসারিক অসুস্থতা কাটাতে সাহায্য করি আমরা। যৌনকর্ম হল প্রকৃত কর্ম। আমরা কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করি। আমরা শ্রমিকের বৈধ অধিকার দাবি করি।" ব্যাস। কোনও সরাসরি বিতর্কে যেতে তাঁদের খুব অনীহা। ওদের কথাগুলো বারবার শুনলে যে-কারুর মনে হবে যেন পাখিপড়া বুলি, হোমওয়ার্ক করা, যেন পেছন থেকে এঁদের মুখে কথাগুলো বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ...আর ওরা? ওই যে দূরে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা অপুষ্ট ক্লিষ্ট মামুলি সাধারণ যৌনকর্মীরা, বিলকিশ গায়েত্রী পাতনি রেখা আয়েষা, যাদের মুখ থেকে সহজে কথা বেরোয় না, যারা মিছিলের শেষ দিক ভরাট করে সবসময়, ওরা কী বলেন? শোনা যায় না; আর শোনা গেলেও, কে জানে, হয়ত একই রকম শেখানো তোতাবুলি শোনা যেত।

মনের আসল ইচ্ছে আসল দাবি তো জানা যায় কাজে, কথায় নয়। একটু চেনা পরিচয় হলেই বোঝা যায়, 'লাইনে'র মেয়েদের সবারই মনের কথা হল —আমাদের সন্তানরা যেন কোনও দিনই এ লাইনে না আসে; তারা যেন লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোকের সমাজে মিশে যেতে পারে। বছর খানেক আগে শেঠ গলির গীতা কাগজে খবর হয়েছিল, ছবিসহ। দুর্বার-এর এই সক্রিয় সদস্যা এড্‌স আক্রান্ত হয়েছে, সমন্বয় কমিটি তার চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছিল, প্রচার-মাধ্যমে সাহায্যের আবেদন জানানো হয়েছিল। সুশ্রী চেহারার সেই যৌনকর্মী গীতা আজ এড্‌স-এর মরণ-কামড়ে কঙ্কালসার। এ-হাসপাতাল ও-হাসপাতাল ঘুরে এখন স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিন-এ ধুঁকছে। দুর্বার কমিটি তাকে ত্যাগ করে যায় নি অবশ্য, কিন্তু গীতা তার অতীতকে ত্যাগ করতে চায়।

তার শেষ জীবনের একমাত্র চিন্তা —মেয়ে পূর্ণিমা। সে যাতে কোনও আশ্রম বা হোমে বড় হয়ে উঠতে পারে, যেন কোনওদিন তার মায়ের পাড়ায় পা না রাখে। গীতা আজ ভুলেও দাবি করে না এই কদর্য পেশা টিকে থাকুক।

কেবলমাত্র গীতা নয়, শান্তিপুর ছোটবাজারের শিখা বসাক, শেওড়াফুলির রিঙ্কি ভগৎ, রমা দাস, শেঠ গলির শান্তি, কালীঘাটের আসমা বিবি— এরকম শ'য়ে শ'য়ে যৌনকর্মী মা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁদের সন্তানদের এ পেশা থেকে দূরে রাখতে। তারা যেভাবেই হোক, বাচ্চাদের কোনও ভাল হোম বা আশ্রম বা কোনও দরদী সংস্থার আশ্রয়ে রাখতে চাইছেন খরচ-খরচা দিয়ে, যেখানে লেখাপড়া শিখে বড় হয়ে ওরা ভদ্রসমাজে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে। যৌনকর্মে নিজের মেয়েকে নিয়ে আসার জন্য পেশা-স্বীকৃতির দাবি এদের কারুর নয়। আমাদের খেয়াল পড়বে, দুর্বার-এর আগে আর কোনও যৌনকর্মী সংগঠন বা কোনও আগুয়ান যৌনকর্মী এরকম দাবি করেনি।

তাহলে এ কাদের দাবি?

সেটাই গূঢ় প্রশ্ন। কাদের দাবি? যাদের বুদ্ধি পরামর্শ পরিকল্পনা আর সাহায্য নিয়ে 'দুর্বার' এই দাবিটাকে তাদের ফেস্টুনে তুলে নিয়েছে, সেই নেপথ্যচারী এন. জি. ও.-র শিক্ষিত চৌকষ 'ভদ্র' ঘরের (যারা যৌনকর্মী নন) পরিচালক ও সংস্থা সদস্যরা কি এ দাবির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সামিল হবেন? যদি কখনও যৌনপেশা এ রাজ্যে আইনি স্বীকৃতি পায়, 'যৌনকর্মী নিয়োগ কমিশন' তৈরি হয়, তখন কি ওই এন. জি. ও. - কর্তা কর্মীরা তাঁদের ঘরের মেয়েদের সে 'কাজ' নিতে পাঠাবেন?

জানা কথা পাঠাবেন না। বেশ্যার কাজ কেউ সাধ করে নেয় নাকি? বরং এখন যেমন করছেন তারা, 'ভদ্র' সমাজে থেকে, 'ভদ্র' স্কুল-কলেজে পড়ে, 'ভদ্র' কেরিয়ার করা, সেরকমই করবেন। তবু কিন্তু ওনারা যৌনকর্মীদের পেশা-স্বীকৃতি দাবি আদায়ের আন্দোলনে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছেন। হিসেবের গরমিলটা এখানেই। কেমন যেন অভিসন্ধির গন্ধ পাওয়া যায়।

তাই, অমানবিকতা অমর্যাদা ঘৃণা লাঞ্ছনার থেকে মুক্তির স্বপ্ন যদি দেখতেই হয় তবে এই নিকৃষ্ট যৌনপেশার বিকল্প কোনও সুস্থ নিরাপদ কাজের দাবি কেন নয়? কেন গ্রাম-মফঃস্বলের দারিদ্রতাড়িত যৌনকর্মী মেয়েদের স্থানীয়ভাবে অর্থ-সংস্থান প্রকল্পের দাবি উঠবে না? এ দাবি সহজে পূরণ হবার নয় ঠিকই, কিন্তু কোন্ সামাজিক অর্থনৈতিক লড়াইটা সহজে জেতা যায়? লড়াই চালিয়ে তো যেতেই হয়। 'পিটা' বাতিল করে 'যৌনব্যবসার বৈধতা কায়েম করা'টাও কি সহজে হবে? ১৯৯৭-এ সল্টলেক স্টেডিয়ামের সেই প্রথম জাতীয় সম্মেলনে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত স্বয়ং উপস্থিত থেকে যৌনপেশার মেয়েদের ট্রেড ইউনিয়ন গড়ে তোলায় সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সে সব 'বাণী' আজ কোথায়? ইন্দ্রজিৎবাবু প্রয়াত হয়েছেন। আমাদের দেশে বা রাজ্যে প্রতিশ্রুতি রাখবার জন্য বোধহয় দেওয়া হয় না।

অর্থ আর রাজনীতির খেলা আমরা বারবার নানা রূপে দেখি। সে খেলায় দাবার ঘুঁটি হবে কেন 'দুর্বার'? হাজারো বঞ্চিতা লাঞ্ছিতা মেয়েদের নিয়ে দুর্বার লড়াই যদি চালাতেই হয় তবে তা নারীর স্থায়ী যৌনদাসী হয়ে থাকার বিরুদ্ধে চালিত হোক। তাদের ভাঙিয়ে খাওয়ার কৌশলের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ যৌনকর্মীরা প্রকৃত দুর্বার হয়ে উঠুক।

টপ কোয়ার্ক,
ডিসেম্বর২০০৪ - আগস্ট ২০০৫

বারবনিতারা বলছি ...

আমাদের ভরসা একটাই যে আমাদের ব্যাপারে কৌতূহল আছে অনেকেরই। অবশ্য, কুণ্ঠা সংকোচ এবং ভীতিও আছে অনেকের -আমাদের ঘিরে। অনেকের কাছে আমরা একধরনের অদ্ভুত জীব — কি করি, কি খাই, কেমন করে বেঁচে থাকি, সবই যেন রূপকথায় মোড়া। আমাদের এলাকায় ঢুকতে অনেক বাবু-মশায়ের গা ছম্‌ছম্ করে।

মাঝে মাঝে 'ভদ্রবাবুরা' যে আসেন না তা নয়। তারা আমাদের সাথে কথা বলেন, কাগজে-টাগজে লেখেন। শুনেছি আমাদের নিয়ে সিনেমা, উপন্যাস বাজারে চলে ভালো।

সাদা কথায় — আমরা 'বেশ্যা'। ভদ্রবাবুদের ভাষায় পতিতা। রেতের বেলা বাবু বসাই, বাবুদের সাথে মদ খাই, মার খাই। কামড়, আঁচড় সবই সহ্য করি। খিস্তির কথা আর নাই বা বললাম, সে সব মনে বাজে তো গায়ে বাজে না। 'বেশ্যার আবার মন!' বিশ্বাস করুন, আর দশটা পেশাদার মানুষের মতো 'মন' আমাদেরও ছিল, আছে, আর থাকবেও। নিজের ছেলে-মেয়েদের খাওয়ানো-পরানোর খরচা জোটাতে আমাদের অনেকেই যে এ পেশায় এসেছে — সে কথা কিন্তু সত্যি।

এদেশের আইন বড় মজার। ঘরে বসে ব্যবসা চালানো যাবে, রাস্তায় দাঁড়ালেই দোষ! পতিতা মায়েরা তাদের বাচ্চাদের নিজের কাছে রাখতে পারবে না। তবে কে রাখবে? এ-পেশা যে আছে, চলছে, সরকার জেনেও জানে না, মেনেও মানে না। এ-পেশা তুলে দেওয়ার জন্য অনেকে, অনেকবার সৎ প্রচেষ্টা নিয়েছেন, অনেক পরিকল্পনাও হয়ত হয়েছে, কিন্তু চোখে তো দেখেছি —কিছুই হয় নি শেষ পর্যন্ত। কে আর সাধ করে এমন পেশায় আসে বলুন? তবু, সে-ই তো আসতে হলো আমাদের এ-লাইনে। এসে দেখছি কতশত মেয়ে আসছে, অসতে বাধ্য হচ্ছে এ লাইনে।

সমাজের মালিকেরা, নেতা মানুষেরা, ছলে বলে কৌশলে মেয়েদের এখানে পাঠায়, কখনো সোজাসুজিভাবে, কখনো বা পেছন থেকে দড়ি টানাটানি করে —এ সব কথা অল্পবিস্তর জানেন বা বোঝেন আজ অনেকেই।

কিন্তু আমাদের জগতটা এখনো বেশির ভাগ মানুষের কাছে আলো-আঁধারিতে ঘেরা। লাল-এলাকা (Red light area) মানে 'নিষিদ্ধ' জায়গা। নিষিদ্ধ পল্লীর জীবনকথা গল্প-উপন্যাসে একরকম, বাস্তবে অন্যরকম। নিষিদ্ধ পল্লীতে মেয়ে কেনাবেচা হয়, মস্তান-গুণ্ডারা 'তোলা' নেয়, দরকারে খুন জখম করে, খদ্দের ফুসলায়, পুলিস রাত-বিরেতে তুলে নিয়ে যায়—এ সব কথা কম-বেশি জানা আছে অনেকের। কিন্তু এ সবের গভীরেও আরো অনেক নির্মম সত্যি রয়েছে, সে সব জানতে গেলে বুঝতে চাইলে নিষেধের গণ্ডী পেরিয়ে আসতে হবে আমাদের কাছে। সে সাহস, সে সদিচ্ছা কজনের রয়েছে জানি না। তবু, আশা তো রাখি।

বেশিরভাগ পতিতারাই 'বোকা' এবং নিরক্ষর। যে যেমন আমাদের ভোলায় আমরা সেরকম ভুলে যাই। নিষিদ্ধপল্লীর চারপাশের লোকেরা ওৎ পেতে থাকে, কিভাবে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে নিজের আখের গুছিয়ে নেবে। সত্যি কথা বলতে কি, এখন আমরা কাউকেই বিশ্বাস করি না। প্রথম প্রথম সবাইকে বিশ্বাস করতাম, যত বিশ্বাস করেছি তত ঠকেছি, অবশ্য বিশ্বাস না করেই বা উপায় কি? তাই এখনো আমরা মিষ্টি কথায় ভুলে যাই। (কেউ তো আমাদের মিষ্টি কথা সচরাচর বলে না।) লিখতে পড়তে জানি না বলে আমাদের দিয়ে টিপ সই করিয়ে কতজন, কতভাবে ঠকিয়ে গেছে, ঠকিয়ে যাচ্ছে।

এ লাইনে ঢোকার পর প্রায় সব মেয়েই প্রথম প্রথম খুব চেষ্টা করে এখান থেকে পালিয়ে যেতে —কিন্তু কেউই প্রায় পারে না। তারপর ক্রমে ক্রমে এটাকেই ভাগ্য বলে মেনে নেয়। ব্যবসার 'ছলাকলা' শিখে নিতে বেশি সময় লাগে না। না শিখলে পেট চলবে কি করে? আর চাইলেই কি কোনো মেয়ে সারাদিন কেঁদে, বুক চাপড়ে দিন কাটাতে পারবে? নিষিদ্ধ পল্লীতে সেটুকু স্বাধীনতাও মেয়েদের থাকে না। আসলে, এ সব কথা শুরু করলে দিন কেটে যাবে, কথা ফুরোবে না। দিদিমনিরা, কখনো কি ভেবেছেন, আমাদের ব্যবসার বয়েস পেরিয়ে গেলে কোথায় আমরা যাই, কি করি? আপাতত সে কথা থাক।

আজ যে কথা বলতে এত কথা বললাম তার রেশ একটু পুরোনো। ভাগ্য আমরা মানি না এমনটা নয়। তবু কেমন করে যেন শেঠ গলির বেশ কিছু মেয়ে সেদিন এককাট্টা হয়ে গিয়েছিল। বেদম মার দিয়েছিল ল্যাংড়া মস্তানকে। সময়টা ১৯৮৬-র মে মাস। মার খেয়ে আমাদের অনেকেরই মাথা ফেটেছিল, হাসপাতাল-পুলিশ-আদালত সব হয়েছে। কিছুদিনের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল ঐ এলাকার মেয়েরা। গড়ে উঠেছিল 'মহিলা সংঘ'। তারপর দিন গেছে, সব কিছুই যেমন সময়ের সাথে পাল্টায়, নিষিদ্ধ পল্লীর রূপ আর বোলচালও ধীরে ধীরে পাল্টে গেছে। এ পাল্টানো ভেতরের না হতে পারে, কিন্তু বাইরে বাইরে সে অনেক পাল্টে গেছে। সে-ও এক লম্বা গল্প, চট্ করে শেষ করা যাবে না। ইদানিং এডস রোগের কল্যাণে দলে দলে সব নতুন সংগঠন ঝাঁপিয়ে পড়ছে নিষিদ্ধপল্লীতে —তারা আমাদের 'সেবা' না করে ছাড়বে না। সে কি কামড়া-কামড়ি— চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। এ বলে আমি বেশি সেবা করব, সে বলে না, আমি। আমরা তো খুব ঘাবড়ে গেছি। এ আবার কি? মানুষের হঠাৎ এমন পরিবর্তন হয় কি করে? আমরাও তো কম বাবু ঘাঁটি নি। দোষ নেবেন না বাবু-মশায়রা, নিজের স্বার্থ ছাড়া আমরা তো ক্বচিৎ কাউকে দেখেছি এ সব মহল্লায় ঢুকতে। তাই ভরসার থেকে ভয়টাই বেশি। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় তো পাবেই। এখন দেখছি ভয়টা ফালতু নয়। শুনছি কোটি কোটি টাকা আসছে দেশ-বিদেশ থেকে। আর টাকা মানেই ব্যবসা —এছাড়া বিশেষ কিছু বুঝি না আমরা। কেউ ব্যবসা করলে আমাদের কিছু যায় আসে না, তবে মা-বোনেরা এটা নিশ্চয়ই মানবেন, আপনাদের ভাঙিয়ে কেউ ব্যবসা চালালে সেটা আপনারও ভালো লাগবে না। সমাজের চোখে পতিতারা খুবই খারাপ মেয়ে —আপনারাই বা কি ভাবেন জানি না। তবে দিব্যি গেলে বলছি —আমাদেরও খুব 'মা' হতে ইচ্ছে হয়। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা অনেকেই বাচ্চার মা। আমাদের সব গেছে, একটাই স্বপ্ন —আমাদের বাচ্চারা যাতে মানুষ হয়, তাদের যেন কোনোদিন এ পেশায় জড়িয়ে পড়তে না হয়। আমাদের সম্মান করতে না পারেন —না করুন। কিন্তু আমাদের এই আশ্রয়টুকু কেড়ে নেবেন না। আমাদের বাচ্চারাও আর সব বাচ্চার মতোই। তাই আমরা নতুন করে জড়ো হয়েছি 'মহিলা সংঘ'-এ। অপরের হাতে ছেড়ে না দিয়ে এবার নিজেরাই গড়ব এদের জন্য আলাদা ঘর। আমাদের তো ঘর-বার সব গেছে। তা বলে আমাদের বাচ্চাদেরও একটা ঘর থাকবে না? আমাদের বিশ্বাস, এই আশ্রয়টুকু গড়ে উঠলে আমরা পরাধীন থেকেও স্বাধীন হওয়ার অন্তত স্বপ্নটাও দেখতে পারব।

পারবেন —এই স্বপ্ন দেখার চেষ্টায় কিছু সাহায্য, সহায়তা দিতে? না পারুন ক্ষতি নেই। শুধু যদি তাদেরকে আটকে রাখতে পারেন যারা আমাদের প্রতি পদে পদে বাধা দেয় তাহলে বাকিটুকু আমরা গড়ে নেব। প্রয়োজনে, আমাদের মুখোমুখি বসতে হবে আপনাদের, দাঁড়াতে হবে ঘেঁষাঘেঁষি করে। ভেবে দেখবেন একটু। কী, আসবেন? যোগাযোগ করবেন নিচের ঠিকানায়?

আশা সাধুখাঁ

সচিব : মহিলা সংঘ, ৫, শেঠবাগান লেন। কলকাতা - ৭০০০০৬

উৎস মানুষ মার্চ, ১৯৯৩

কষ্টকল্পিত শেষের সেদিন

পৃথিবীর বিপর্যয় কি সত্যিই আসন্ন?

অমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

পৃথিবীর সব দেশে একটা আতঙ্ক ভালো মতন ছড়িয়ে পড়েছে তা হল — এ বছর অর্থাৎ ২০১২ সালের ২১ ডিসেম্বর মহাপ্রলয় ঘটবে, আর তার প্রভাবে এই দিনেই হবে পৃথিবীর মৃত্যু, এক কথায় ২১ ডিসেম্বর পৃথিবীর বর্তমান অস্তিত্বের শেষ দিন। এ গুজব-চর্চার ব্যাপারে আমেরিকা, ইউরোপ, জাপান কিংবা চীনের কোনও ফারাক নেই। স্থানীয়ভাবে এই সব দেশেই প্রচারিত হয়েছে, অমুক দিনই পৃথিবীর শেষ দিন। এই দিনটিকে কেন্দ্র করে হলিউডের বিশিষ্ট চলচ্চিত্র-নির্মাতা ইংরেজিতে '২০১২' শিরোনাম দিয়ে একটা পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবিও ইতিমধ্যে তৈরি করে ফেলেছেন। ছবিটি সারা বিশ্বের প্রধান প্রধান শহরে এরই মধ্যে প্রদর্শিত হয়েছে, আর কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহেও ৬ সপ্তাহ চলেছিল। এতেই বুঝতে পারা যায়, এই ছবির কী অসাধারণ অভ্যর্থনা! এই বিষয়ের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি।

মহাপ্রলয়ের আতঙ্ক নতুন কোনও ব্যাপার নয়। মানবজাতির ইতিহাসে কতবার যে মহাপ্রলয় এবং পৃথিবীর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে, তার কোনও ইয়ত্তা নেই। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে এইসব ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ছড়িয়ে রয়েছে নানান পুরাণ, মহাকাব্য ও সাহিত্যে। মধ্যযুগের অন্ধকার পেরিয়ে আধুনিক যুগের আলোকবৃত্তেও পাওয়া যাবে এমন হাজার হাজার মহাপ্রলয়ের ভবিষ্যদ্বাণীর কথা।

এই ব্যাপারে মনে করিয়ে দিতে চাই, আমাদের দেশেই অল্প কয়েক বছর আগেকার একটা ঘটনা। ১৯৮২ সালের ১০ মার্চ তারিখে সৌরজগতে নয়টি গ্রহ, সূর্যের একই পাশে ৯৬ ডিগ্রি কৌণিক দূরত্বের মধ্যে অবস্থিত হয়েছিল। বৃত্তের পরিধির প্রায় এক চতুর্থাংশ পাদের মধ্যে সমস্ত গ্রহগুলোর একটা বিশেষ সম্মিলন ঘটেছিল, এমন সমাবেশে বেশ কিছুটা অভিনবত্ব আছে এবং এরকম সমাবেশের সাধারণ পুনরাবৃত্তি ঘটে ১৭৯ বছর পর পর। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানে এমন একটা ঘটনা নিশ্চয়ই সুবিরল বলে আখ্যা দেওয়া পায়। সেই সময়ে আমি কলকাতার পজিশন্যাল অ্যাস্ট্রনমি সেন্টারের ডিরেক্টর। ভারতের প্রধান প্রধান শহরে গ্রহশান্তি জন্য যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একমাত্র হরিদ্বারেই বিশাল এক যজ্ঞ হয়েছিল, যার জন্য খরচ পড়েছিল ২০ লক্ষ টাকা। কলকাতাতেও বিডন পার্কে বহু অর্থ ব্যয় করে যজ্ঞ হয়েছিল। আমি ওই তারিখের প্রায় চার মাস আগে, দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, একটি 'The Statesman' পত্রিকায়, অপরটি 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য়। তাতে জ্যোতির্বিজ্ঞানের তত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্য করে দেখিয়েছিলাম, এমন সম্মেলনে পৃথিবীর কোনওরকম কোনও ক্ষতি হতে পারে না, ১০ মার্চ তারিখটি

প্রত্যেক দিনের মতো আসবে, আবার চলেও যাবে, কোনও রকম আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

এ বছর ২১ ডিসেম্বরে পৃথিবী একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর উৎস খুঁজলে দেখতে পাই, এর উৎস হল মায়া সভ্যতা। দক্ষিণ মেক্সিকোতে একটা ছোট শহর আছে, তার নাম 'টপচুলা', এই শহরের একেবারে এক প্রান্তে একটা পাহাড় আছে, আর এই পাহাড়ের চূড়ায় আছে মায়া সভ্যতার ক্যালেন্ডার। এই পাহাড়ের চূড়ায় একটা বেশ বড় প্রস্তরখণ্ড আছে, আর এই শিলায় খোদাই করা আছে মায়া সভ্যতার ৫১২৬ বছরের ক্যালেন্ডার। ৫১২৬ বছর হল মায়া সভ্যতার ক্যালেন্ডারের একটি কালচক্র। এই খোদাই করা ক্যালেন্ডারে ২০১২ সালের ২১ ডিসেম্বরের পরে আর কোনও তারিখ খোদাই করা নেই, এর থেকে মায়া সভ্যতার পুরাণ লিপিতে যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা বলছেন —২১ ডিসেম্বরেই বর্তমান পৃথিবীর শেষ দিন। ওঁদের সৃষ্টিদেবতার নাম হল 'বোলন ওক্তে'। ওঁরা বলছেন, পৃথিবীর ধ্বংস হওয়ার পরে ওঁদের সৃষ্টিদেবতা বোলন ওক্তে-র আবার আবির্ভাব হবে, আর তিনিই আবার নতুন করে পৃথিবী সৃষ্টি করবেন। পৃথিবীর ধ্বংস কেমন করে হবে? সে ব্যাপারেও মায়া সভ্যতার পণ্ডিতরা বলেছেন, পৃথিবীর বাইরে থেকে বিশাল কোনও গ্রহের মতো বস্তু সবেগে এসে পৃথিবীকে আঘাত করবে, আর তারই পরিণতিতে পৃথিবীর ধ্বংস অনিবার্য।

এখন আমরা বিশ্লেষণ করে দেখতে পারি, পৃথিবীর বাইরে থেকে এসে, পৃথিবীর সঙ্গে কারোর সংঘর্ষ বাধার সম্ভাবনা আছে কাদের। পৃথিবীর চতুঃসীমার মধ্যে মহাকাশের যে অংশ বিস্তৃত, সেখানে স্থানে স্থানে বহু বস্তুকণা অবস্থান করছে। কখনো কখনো

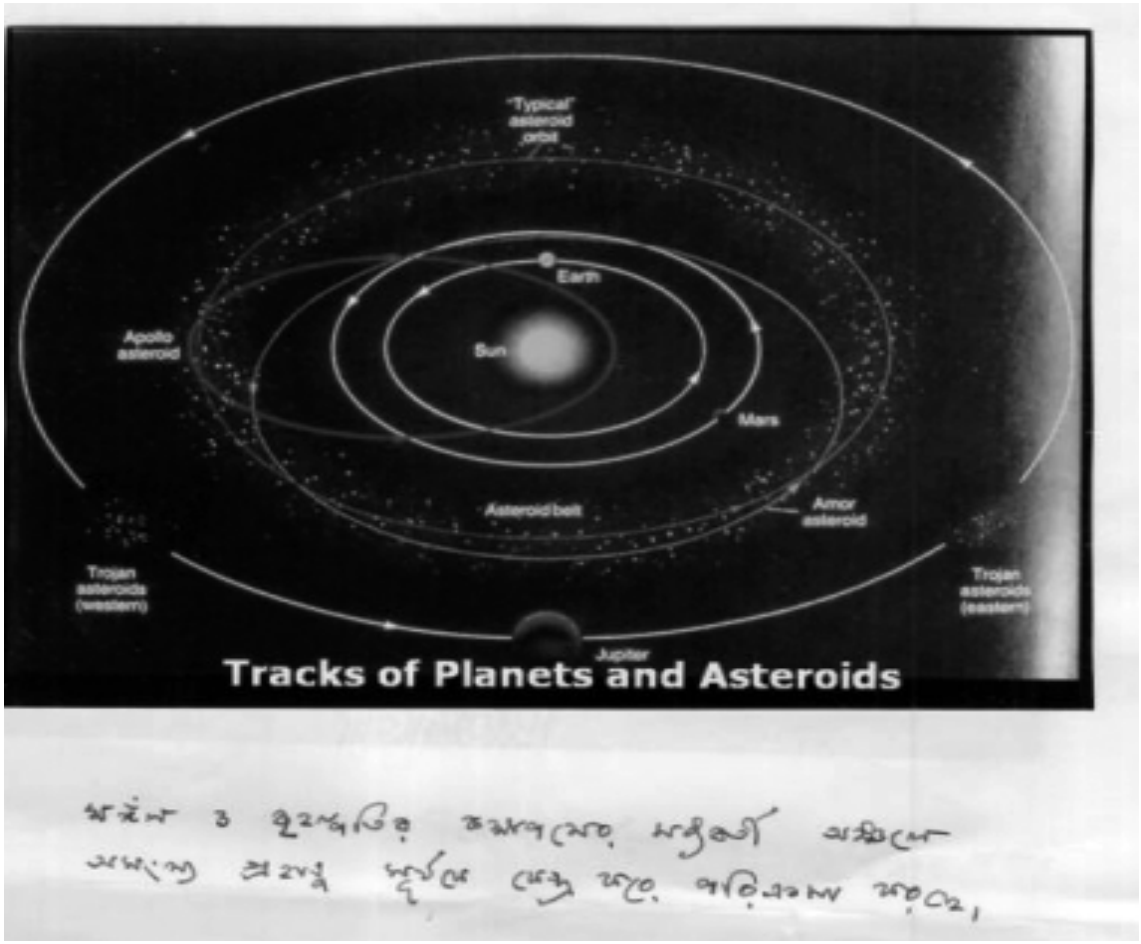

এমন বস্তুকণা পৃথিবীর যথেষ্ট কাছে চলে আসে, তখন পৃথিবীর অভিকর্ষের বলে এই কণাটি বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে দ্রুতবেগে পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে নামতে থাকে, তখন বায়ুমণ্ডলের ঘন অংশের

সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এটি জ্বলতে শুরু করে, আর জ্বলতে জ্বলতে পৃথিবীপৃষ্ঠের দিকে নামতে থাকে। তখন রাতের আকাশ হলে আমরা দেখতে পাই যেন জ্বলন্ত একটা তারা খসে পড়ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমন বস্তুকণা ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছবার অনেক আগেই, পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এমন ঘটনা জ্যোতির্বিজ্ঞানে 'উল্কাপাত' বলে অভিহিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উল্কা চলমান অবস্থাতেই নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু কখনো কখনো

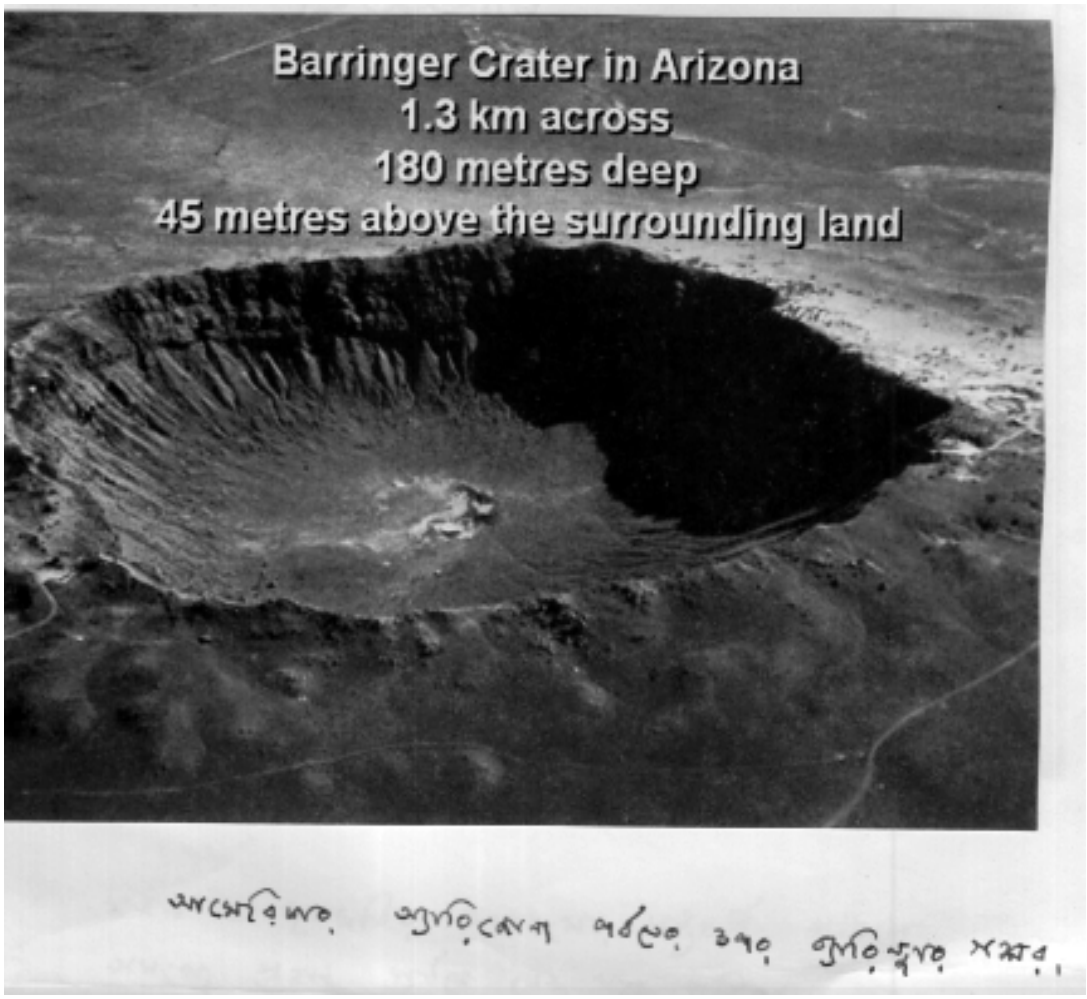

মূল উল্কাপিণ্ডটি এত বড় থাকে যে পুড়ে যথেষ্ট ছোট হয়ে গিয়েও সেটি পৃথিবীর মাটিতে পৌঁছতে পারে, তখন মাটিতে এসে যে বস্তুটি পৌঁছলো, তাকে বলা হয় 'উল্কাখণ্ড', ইংরেজিতে 'মেটিওরাইট'। কখনো কখনো এমন উল্কাখণ্ড এত বড় আকারের হয়, তারা পৃথিবীর মাটির ওপর এসে বিরাট জ্বালামুখ বা গহ্বরের সৃষ্টি করে। পঞ্চাশ হাজার বছর আগে ৪০ মিটার ব্যাসের একটি উল্কাখণ্ড আমেরিকার অ্যারিজোনা পর্বতের ওপর এসে পড়েছিল, আর তারই দরুন এক বিরাট গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল, এর বর্তমান নাম ব্যারিঞ্জার গহ্বর (Barringar Crater), এই গহ্বরের ব্যাস ১.৩ কিলোমিটার। এর চেয়েও একটা বড় গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল, উল্কাখণ্ডের আঘাতের দরুন, কানাডার হাডসন বে-তে। এর থেকে একটা তথ্য খুব সুস্পষ্ট, উল্কাখণ্ডের আঘাতে পৃথিবীর ধ্বংস কখনই সম্ভবপর নয়।

বাইরে থেকে এসে পৃথিবীর ওপর আছড়ে পড়তে পারে আর কে? সে হল গ্রহাণু, ইংরেজিতে এদের বলা হয় অ্যাস্টেরয়েড। মঙ্গলের পরিক্রমার পথ, আর বৃহস্পতির পরিক্রমার পথের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের টুকরো, সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরে চলেছে, এইসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহের টুকরোদের বলা হয় গ্রহাণু। এই গ্রহাণুদের মধ্যে এক শ্রেণীর গ্রহাণু আছে, যারা সূর্যকে কেন্দ্র করেই পরিক্রমা করছে, কিন্তু এরা

পৃথিবীর কক্ষপথ এবং মঙ্গলের কক্ষপথ অতিক্রম করে চলে যায়, এদের বলা হয় অ্যাপোলো গ্রহাণু (অ্যাপোলো অ্যাস্টেরয়েড)। এখন যে সময়ে অ্যাপোলো গ্রহাণুটি পৃথিবীর কক্ষপথ অতিক্রম করছে, ঠিক সেই সময়ে ওই স্থানে যদি পৃথিবী অবস্থিত হয়, তাহলে পৃথিবীর সঙ্গে গ্রহাণুটির সংঘর্ষ বাধবে, আর তার ফলে পৃথিবীর কোনও অংশের সাংঘাতিক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই অ্যাপোলো গ্রহাণুর দ্বারা পৃথিবীর একটা ধ্বংসের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বিজ্ঞানীরা অ্যাপোলো গ্রহাণুদের সূর্য পরিক্রমার তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, গড়পড়তায় পৃথিবীর সঙ্গে অ্যাপেলো গ্রহাণু সংঘর্ষের সম্ভাবনা আড়াই লক্ষ বছরে একবার। এরকম গ্রহাণুর ব্যাস যদি দু'কিলোমিটার হয়, তাহলে পৃথিবীর সঙ্গে সংঘর্ষে যে বিস্ফোরণ ক্ষমতার সৃষ্টি হবে, তা প্রায় এক লক্ষ মেগাটন বোমার সমান, এর তাৎপর্য হল ভারতের ওপর এমন গ্রহাণু এসে পড়লে, সারা ভারতই ধ্বংস হয়ে যাবে।

এখানে একটা কথা উল্লেখ করতে চাই। সাড়ে ছ'কোটি বছর আগে একটা ১০ কিলোমিটার ব্যাসের গ্রহাণু দক্ষিণ মেক্সিকোর ইউক্যাটান পেনিনসুলার ওপর এসে পড়েছিল, আর এই সংঘর্ষের ফলে ওই স্থানে এক গভীর গহ্বর সৃষ্টি হয়েছিল, এর ব্যাস কয়েকশো কিলোমিটার। এই সংঘর্ষে যে বিস্ফোরণ ক্ষমতার সৃষ্টি হয়েছিল, তারই দরুন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণ ধূলিকণা উৎক্ষিপ্ত হয়, আর তার ফলে বেশ কয়েক বছর সূর্যের আলো স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীর মাটির ওপর আসতে পারে নি। পৃথিবীর ওপরে যেসব নানারকমের গাছ ছিল, তাদের বিনাশ ঘটে, আর এরই দরুন উদ্ভিদভোজী ডাইনোসরদের বিলুপ্তি ঘটে। তাই অ্যাপোলো গ্রহাণুদের সংঘর্ষে পৃথিবীর বিশেষ ক্ষতি ও ধ্বংসের সম্ভাবনা নিশ্চিতরূপে আছে।

এখানে আর একটা তথ্য জানার প্রয়োজন আছে। আমেরিকার মহাকাশবিজ্ঞান সংস্থা 'নাসা' পৃথিবীর সঙ্গে গ্রহাণুর সংঘর্ষ মোকাবিলার জন্য এরই মধ্যে 'Asteroid Flyby Mission' পরিকল্পনা করে ফেলেছেন। মাস তিনেক আগেও যদি ওঁরা জানতে পারেন কোনও গ্রহাণুর দ্বারা পৃথিবীর সংঘর্ষের সম্ভাবনা, তাহলে নাসার বিজ্ঞানীরা একটা মহাকাশযান পাঠাবেন, ওই মহাকাশযান গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘর্ষের আগেই তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হবে এবং গ্রহাণুটিকে বেশ কয়েকটি রকেটের আঘাত দ্বারা তার স্বাভাবিক গতিপথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে, এতে পৃথিবীর সঙ্গে গ্রহাণুর সংঘর্ষ এড়ানো সম্ভবপর হবে বলে ওঁরা মনে করছেন।

তাহলে একটা জিনিস খুব স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা গেল, গ্রহাণুর সংঘর্ষে পৃথিবীর একটা বিশিষ্ট অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সারা পৃথিবীর ধ্বংস কখনই ঘটবে না। আর একটা কথা, পৃথিবীতেই যদি প্রবল ভূমিকম্প হয়, বা বন্যা হয় বা আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, তাতেও সারা পৃথিবীর বিপর্যয় আসতে পারে না। পৃথিবীর ধ্বংস বা বিপর্যয় শুধুমাত্র সেদিনই আসবে, যেদিন সূর্যের মৃত্যু ঘটবে, সূর্যের মৃত্যু এখনও বাকি আছে প্রায় পাঁচশো কোটি বছর। তাই পৃথিবীর সম্পূর্ণ হওয়ার এখনো প্রায় ৫০০ কোটি বছর বাকি আছে। তাহলে মায়া সভ্যতার এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণীর তাৎপর্য কী? তাৎপর্য একটাই, প্রাচীন মায়া সভ্যতার মানুষের সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, আর বুজরুকি দিয়ে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কিত করা। একটা গ্রহাণুর সঙ্গে পৃথিবীর সংঘর্ষ লাগবে কিনা এটা ঠিকভাবে জানতে হলে বিজ্ঞানীদের নিতান্ত প্রয়োজন সুপার কমপিউটার। সেই প্রাচীন সময়ে মানুষের কাছে কোনও কমপিউটারই ছিল না, তাই তারা অত আগে থেকে এমন একটা সংঘর্ষের তথ্য সংগ্রহ করবে কেমন করে? এর থেকেই বুঝতে পারা যায় এমন একটা ভবিষ্যদ্বাণী পুরোপুরি একটা বুজরুকি ছাড়া আর কিছুই নয়। আর মানুষকে আতঙ্কিত করতে পারলে, পৃথিবীর এক শ্রেণীর মানুষের প্রচুর অর্থ সমাগম, যেমন ঘটেছে এই ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা। হলিউডের যে চলচ্চিত্র নির্মাতা '২০১২' ছবিটি নির্মাণ করেছেন, তাঁরা ইতিমধ্যে এই ছবিটি সারা বিশ্বে প্রদর্শন করে প্রায় একশো কোটি মার্কিন ডলার উপার্জন করেছেন, আজ পর্যন্ত হলিউড থেকে যে ৪০টি ছবি সর্ব সময়ের জন্য বক্স-অফিস হিট হয়েছে, তাদের মধ্যে এই '২০১২' ছবিটি সবার ওপরে। তাছাড়া আমেরিকা, ইউরোপ ও জাপানে জ্যোতিষীরা দারুণ সক্রিয় হয়ে সাধারণ মানুষকে এই বিপদ থেকে মুক্ত করার জন্য নানারকমের তাবিজ, কবচ ও মাদুলি প্রদানের ব্যবস্থা ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন। এইখানেই এরকম ভবিষ্যদ্বাণীর দুর্দান্ত সাফল্য। এখানে আর একটা কথাও উল্লেখ করতে হয়, সারা পৃথিবীর সব রকমের প্রচার মাধ্যম এইসব ব্যাপার সাড়ম্বরে প্রচার করে, তারাও যথেষ্ট ধাপ্পাবাজ। প্রচারমাধ্যমের এমন কোনও কিছু প্রচার করা উচিত নয়, যার দ্বারা সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়।

উ মা

বাণিজ্যিক নয় মানবিক
স্বাস্থ্যের বৃত্তে

স্বাস্থ্য, রোগ, চিকিৎসা, বিজ্ঞান ও সমাজ নিয়ে আপনার সহমর্মী দ্বিমাসিক পত্রিকা।

প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুকমার্ক, পিপল্‌স বুক সোসাইটি, বই-চিত্র, অম্লান দত্ত বুক স্টল (বিধাননগর পুরসভা), শ্রমিক-কৃষক মৈতরী স্বাস্থ্য কেন্দ্র (চেঙ্গাইল), ডাঃ শুভজিত ভট্টাচার্য (উষুমপুর মিনিবাস স্ট্যান্ডের কাছে, আগরপাড়া)। শেয়ালদা মেন সেকশনের বিভিন্ন বইয়ের স্টল। পাঠক এবং এজেন্টদের যোগাযোগ করার ফোন নম্বর : ৯৮৪০৯-২২১৯৪ বা ৯৩৩১০-১২৬৩৭।

ভেষজ ওষুধ : প্রচারে দড়, কাজের কী?

সুনীতিকুমার মণ্ডল

সকলেই সুস্থ থাকতে চায়, ভালো থাকতে চায়। সুস্বাস্থ্যের জন্যে, রোগ-কষ্ট উপশমের জন্যে এবং রোগমুক্তির জন্যে, তাই বহু প্রাচীন কাল থেকেই নানা রকম উপায় অবলম্বন করা হয়ে আসছে। সে সবের সবই যে কাজের তা নয়। কিন্তু যুগ যুগ ধরে চেষ্টার ফলে অনেক কার্যকারী উপায়ের সন্ধান মিলেছে। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞানের আলোকে যাচাই করে তার কিছু আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আবার কিছু বাতিল হয়েছে।

স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যে যে সব উপায় অবলম্বন করা হয়ে আসছে তার মধ্যে অন্যতম ভেষজ ওষুধের ব্যবহার। রোগ সারানোর জন্যে ব্যবহৃত গাছ-গাছড়ার রসই হল ভেষজ ওষুধ এবং যে সব উদ্ভিদ এর জন্যে ব্যবহার হয় সেগুলি ভেষজ উদ্ভিদ। ভারতে বিভিন্নরকম সাবেকি চিকিৎসা পদ্ধতিতে ৮০ হাজার এমন উদ্ভিদ প্রজাতির উল্লেখ আছে। ২০০১ সালের সরকারি নথিভুক্ত, চিকিৎসায় কার্যকারী উদ্ভিদের সংখ্যা মাত্র ৪২৪৬। ভেষজ চিকিৎসকরা অবশ্য ছ'হাজারের বেশি উদ্ভিদ প্রজাতি ব্যবহার করেন। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি ভেষজ উদ্ভিদ সম্পন্ন দেশ ভারত এবং এখানে আড়াই লক্ষ রেজিস্টার্ড আয়ুর্বেদ চিকিৎসক আছেন (১৬.২.২০১০)।

ভেষজ উদ্ভিদ নিয়ে আলোচনা করা খুবই মুশকিলের; কারণ এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের গভীর বিশ্বাস। তাছাড়া আধুনিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিক সহ অনেক ওষুধের প্রাথমিক উৎস ছত্রাক, ব্যাকটেরিয়া এবং বেশ কিছু গাছ-গাছড়া। আবার এটাও ঠিক ভেষজ উদ্ভিদ বলে ব্যবহৃত অধিকাংশের মধ্যে রোগ নিরাময় বা স্বাস্থ্য রক্ষার নির্দিষ্ট কোনো কার্যকর উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ভেষজ ওষুধ সম্পর্কে মানুষের দুর্বলতার অন্যতম কারণ প্রাচীন সব কিছুই ভালো, রোগ নিরাময়ের উপায় প্রকৃতির মধ্যেই ঈশ্বর সৃষ্টি করে রেখেছেন এবং ভেষজ ওষুধের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই —এ রকম কিছু বিশ্বাস। বাস্তবের সঙ্গে যার সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সুফল ভোগ দিনদিন বাড়লেও ওষুধের ব্যাপারে এখনো অধিকাংশ মানুষ সাবেকি চিন্তাভাবনাকেই আঁকড়ে আছেন। এই চিত্র শুধু এ দেশের নয়, সারা বিশ্বের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর ৮০ শতাংশ মানুষ প্রাথমিক চিকিৎসা হিসেবে ভেষজ চিকিৎসার ওপর নির্ভর করে।

এ দেশের আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় ব্যবহৃত ভেষজ ওষুধগুলি খুবই কাজের, কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই ক্ষেত্রটি অবহেলিত এবং কোনো অনুসন্ধানমূলক কাজ হয় নি —এ রকম ধারণা অধিকাংশ মানুষের। তবে এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। বিশ্বজুড়ে এথনোবোটানির কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষজন গাছ-গাছড়ার মধ্যে ওষুধ খোঁজার কাজ করে আসছেন এবং এখনো তা অব্যাহত আছে। এ দেশেও কেন্দ্রীয় সরকারের বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অধীনে এথনোবোটানি বিভাগ আছে। তাছাড়া বিভিন্ন গবেষণাকেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয়েও এর কিছু কাজ হয়। এদের কাজ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে গাছপালার প্রচলিত ব্যবহার সংক্রান্ত অনুসন্ধান করা, যার মধ্যে ভেষজ উদ্ভিদের বিষয়টিও আছে। লোকমুখে চলে আসা কথা থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ওঝা, গুনিন, কবিরাজদের কাছ থেকে, কোন অসুখের জন্যে কোন গাছ ব্যবহার হয়, এ তথ্য যোগাড় সহজে হয় না। নানা কৌশলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সফল হলেও সব ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। আসলে

ওঝা, গুনিন, কবিরাজরা তাঁদের চিকিৎসার কৌশল গোপন রাখতে চান এবং পরিবারের মধ্যেই সেই জ্ঞান আবদ্ধ রাখতে চান।

বিজ্ঞানীরা ভেষজ ওষুধের অনুসন্ধান করে দু'ভাবে। প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রকৃতি থেকে গাছপালা সংগ্রহ করে রোগ নিরাময়ের কোনো কার্যকর পদার্থ আছে কিনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন অসুখে যে সব গাছ-গাছড়া ব্যবহারের প্রচলন আছে সেগুলি সংগ্রহ করে পরীক্ষা করে দেখা হয় আদৌ তাতে কোনো কার্যকর উপাদান আছে কিনা। থাকলে উপাদানটি আলাদা করে বিশুদ্ধ করা হয়।

উদ্ভিদ থেকে ওষুধ তৈরির সবচেয়ে সহজ ও প্রচলিত উপায় থেঁতো করে রস বের করে নেওয়া। সেই রস থেকে উদ্বায়ী তেল বাদ দিয়ে রসের জল বাষ্পীভূত করে ঘন করা হয় কিংবা শুষ্ক করা হয়। এভাবে তৈরি ওষুধ নির্ভরযোগ্য এবং নিখুঁত হয় না। কারণ তাতে রোগ নিরাময়ের কার্যকর উপাদানের সঙ্গে উদ্ভিদের মধ্যে থাকা অন্যান্য পদার্থ মিশে থাকে। তাছাড়া এর সঙ্গে কীটনাশক, অন্য গাছ-গাছড়া এবং জীবজন্তুর মলমূত্র মিশে থাকে।

কোনো রোগের জন্যে কেবল সেই রোগ-নিরাময়ের উপযুক্ত উপাদান দিয়ে চিকিৎসা হওয়া দরকার; বিজ্ঞানীরা সেই চেষ্টাই করেন। ভেষজ উদ্ভিদ থেকে কার্যকর উপাদান আলাদা করা খুব জটিল এবং ব্যয়বহুল। অনেক ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ অবস্থায় কার্যকর উপাদানকে আদৌ আলাদা করা যায় না। এই সমস্যার জন্যেই গাছ-গাছড়ার মধ্যে রোগ নিরাময়কারী রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়ার পর তার রাসায়নিক গঠন জেনে সেগুলির অনুরূপ যৌগ তৈরির কথা ভাবা হয়। কৃত্রিম রসায়নবিদ্যার (Synthetic Chemistry)) সাহায্যে অনেক সহজে এবং কম খরচে এই কাজ করা যায়। এতে ওষুধের বিশুদ্ধতা এবং গুণমান বজায় রাখাও সহজ। এসব কারণেই প্রাথমিকভাবে গাছ-গাছড়া থেকে পাওয়া অনেক ওষুধ পরবর্তী উপায়ে তৈরি শুরু হয়েছে। এখানে কয়েকটি ভেষজ ওষুধের উল্লেখ করা হলো যেগুলি এখন সিন্থেটিক উপায়ে তৈরি হয়।

• ভিনক্রিসটিন —লিউকিমিয়া এবং আরো কয়েক রকম ক্যানাসারের ওষুধ। নয়নতারা উদ্ভিদ থেকে পাওয়া ভিনব্লাসটিন অ্যালকালায়ডের অনুকরণে এটি তৈরি। সে সময় নয়নতারা উদ্ভিদের বোটানিক্যাল নাম *Vinca rosea*, সেই কারণে অ্যালকালায়ডের নামে Vin যোগ করা হয়েছিল।

• কুইনাইন —ম্যালেরিয়ার ওষুধ। এর প্রাথমিক উৎস সিঙ্কোনা গাছের ছাল।

• মরফিনান —তীব্র যন্ত্রণা কমার ওষুধ। পোস্ত ফলের আঠা আফিম থেকে পাওয়া মরফিন এর প্রাথমিক উৎস।

• ডিজোবিসন —হৃদরোগের ওষুধ এবং এর প্রাথমিক উৎস *Digitalis purpurea* উদ্ভিদ।

• ট্যাক্সোল —টিউমারের ওষুধ। এর উৎস Pacific Yew উদ্ভিদ।

• ডায়োসজেনিন —গর্ভনিরোধক ওষুধ এবং এর থেকে নানা রকম স্টেরয়েড তৈরি হয়। এর প্রাথমিক উৎস খাম আলুর (*Dioscorea*) কয়েকটি প্রজাতি।

• অ্যাসপিরিন —ব্যথা বেদনা ও জ্বর উপশমের ওষুধ। কার্যকারী যৌগ অ্যাসিটাইল সালিসিলিক অ্যাসিড এবং তার প্রাথমিক উৎস উইলো গাছের ছাল।

• রেসার পিন —উচ্চ রক্তচাপ ও মানসিক রোগের ওষুধ। এর উৎস সর্পগন্ধা (*Rauwolfia*) উদ্ভিদ প্রজাতি। বর্তমানে আরো ভালো ওষুধ আবিষ্কার হওয়ায় এর ব্যবহার প্রায় বন্ধ।

নির্দিষ্ট রোগের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট উপাদান প্রয়োগ করে চিকিৎসা করা বিজ্ঞান সম্মত। গাছ-গাছড়ার ওষুধের ক্ষেত্রেও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান সেটা করার চেষ্টা করছে। ভেষজ চিকিৎসকেরা অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। তাঁরা মনে করেন নির্দিষ্ট উদ্ভিদের মধ্যে থাকা সবগুলি উপাদান সম্মিলিত ভাবে বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যায় কাজ করে। সেই কারণে ভেষজ উদ্ভিদের মধ্যে কার্যকারী উপাদান খোঁজার ব্যাপারে তাঁরা আগ্রহী নন। অধিকাংশ মানুষও সেভাবেই ভাবেন এবং তাঁরা নিজেরাই নানা রকম গাছ-গাছড়া থেঁতো করে খেয়ে থাকেন বা বাজার থেকে ভেষজ ওষুধ কিনে খান। রক্তে শর্করা বেড়ে যাওয়ার সমস্যায় অনেকেই তেতো খেলে মিষ্টি প্রশমিত হবে এই ভ্রান্ত বিশ্বাসে নিমপাতার রস খেয়ে থাকেন। অথচ নিমের তোতো যৌগ নিমবিডিন, নিমবিন এবং নিমবিনিনের রক্তে শর্করা কমানোর কোনো ক্ষমতা নেই।

যে সব উদ্ভিদে রোগ নিরাময়ের কোনো উপাদান থাকে না তাতেও নানা রকম যৌগ থাকে, যার মধ্যে কিছু ক্ষতিকর পদার্থও থাকতে পারে। আবার যে উদ্ভিদগুলিতে রোগ সারানোর উপযুক্ত উপাদান থাকে সেখানেও আরো নানা রকম যৌগ থাকে এবং সেইসব যৌগগুলি শরীরে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে এখানে সর্পগন্ধার উল্লেখ করা হলো। সর্পগন্ধার শিকড়ের ছাল থেকে পাওয়া রেসারপিন উচ্চ রক্তচাপ ও মানসিক রোগের ওষুধ। কিন্তু প্রজাতি ভেদে সর্পগন্ধায় ২২ থেকে ৩০ রকম অ্যালকালায়ড আছে। সর্পগন্ধার মূলের ছাল থেঁতো করে খেলে রেসারপিনের সঙ্গে সবগুলিই শরীরে যায় এবং তাতে নানা রকম প্রতিক্রিয়া হবার আশঙ্কা থাকে। ওষুধ হিসেবে গাছ গাছড়ার রস খাওয়ার বিপদ এখানেই। থেঁতো করে ভেষজ ওষুধ খাওয়ার অন্য সমস্যা ওষুধের সঠিক পরিমাণ নিয়ে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা একই প্রজাতির উদ্ভিদের মধ্যে বিভিন্ন যৌগের পরিমাণ এক থাকে না, তাই কার্যকারী যৌগের পরিমাণের হেরফের হতে পারে। ওষুধের পরিমাণ কম হলে রোগ সারে না, আবার বেশি হলে নানা রকম সমস্যা হয়। যেমন : (১) বাত, মাইগ্রেন, মাথাব্যথা ইত্যাদির জন্যে ব্যবহৃত *একোনিটাম*-এর

পরিমাণ বেশি হলে বমি, রক্তচাপ কমে যাওয়া, হৃদস্পন্দনের গোলমাল, পেশীর দুর্বলতা ইত্যাদি ক্ষতিকর উপসর্গ দেখা দেয়।

(২) বেলেডোনা ব্যবহার হয় পেটের গোলমাল, হাঁপানি এবং হৃদযন্ত্রের গোলমালে। কিন্তু সেই ওষুধই বেশি মাত্রায় শরীরে গেলে প্রস্রাব পায়খানা বন্ধ হয়ে যায়; স্নায়ু, শ্বাসযন্ত্র ও হৃদযন্ত্রের কাজে সমস্যা সৃষ্টি হয় এবং অস্থিরতা দেখা দেয়।

(৩) এফিড্রা ব্যবহার হয় ফুসফুসের ওপরের দিকে সংক্রমণের সময় সংকুচিত শ্বাসনালী প্রসারিত করে শ্বাস প্রশ্বাস ঠিকমতো চলাচলের জন্যে ও হাঁপানির চিকিৎসায়। কিন্তু ওষুধের বেশি মাত্রায় উচ্চ রক্তচাপ, হৃদপেশীর দুর্বলতা, হৃদপেশী ধ্বংস, উদ্বেগ, অস্থিরতা, খিঁচুনি, মাথাধরা এবং মানসিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এরকম ঘটনা সব ওষুধের ক্ষেত্রেই হতে পারে তাই ওষুধের পরিমাপ সঠিক হওয়া খুব জরুরী।

ভেষজ ওষুধ নিরাপদ এবং আধুনিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধের ওপর এর প্রভাব পড়ে না —অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এরকম বিশ্বাস আছে। অনেকে তাই আধুনিক চিকিৎসার সঙ্গে ভেষজ ওষুধ ব্যবহার করেন। ৬০ শতাংশ লোক তাঁদের চিকিৎসককে না জানিয়েই এমন করে থাকেন এবং এই ঘটনা সব দেশেই ঘটছে। এরকম করা তো ঠিক নয় কারণ অনেক ভেষজ ওষুধের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হয় এবং অনেক ভেষজ ওষুধ অন্য ওষুধের সঙ্গে ক্রিয়া করে তাকে নিষ্ক্রিয় করে দেয়। যেমন : গিঙ্গো বাইলোবা, জেনসিং এবং রসুন দিয়ে তৈরি ওষুধ রক্তক্ষরণ বন্ধ হতে অসুবিধা ঘটায় এবং রক্তক্ষরণ বন্ধের জন্য প্রয়োগ করা ওষুধের কাজ ঠিকভাবে হয় না। গিঙ্গো বাইলোবার ওষুধ অ্যাসপিরিনের সঙ্গেও ক্রিয়া করে। সেরকমই এফিড্রা ক্যাফিন ও শ্বাসনালী সম্প্রসারণের ওষুধ (Decongestant)-এর সঙ্গে ক্রিয়া করে। St. Johan's Wart উদ্ভিদ থেকে তৈরি ওষুধ, হৃদরোগের ওষুধ ডিজোক্সিন এবং অনেক অ্যান্টিবায়োটিকের কাজে বাধা দেয়।

বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যে আধুনিক ওষুধ তৈরি হয় সেগুলি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াহীন তা নয়। সেসব ওষুধ থেকেও নানারকম সমস্যা হতে পারে, তবে সে সম্পর্কে সাবধান করা থাকে। তাই সমস্যার বিষয়টি জানা থাকে। ভেষজ ওষুধের ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কিছু জানা থাকে না বলেই মুস্কিল হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০১ সালের তথ্যে আমেরিকায় ১২০ রকম ভেষজ ওষুধ আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৩০ থেকে ৭০ শতাংশ ওষুধে কোনো না কোনো গাছ-গাছড়ার উপাদান মেশানো থাকছে। কিন্তু কেন? থাকছে ভেষজ ওষুধ সম্পর্কে মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বাণিজ্য করার জন্যে। এসব ক্ষেত্রে রোগ নিরাময়ের আসল ওষুধের সঙ্গে ভেষজ উপাদান মেশানো থাকে। তাই ভেষজ উপাদানে কাজ না হলেও ক্ষতি নেই। নেলসন-এর টেক্স বুক অব পেডিয়াট্রিক্স-এ ভেষজ ওষুধকে কমপ্লিমেন্টারি থেরাপি বা পরিপূরক চিকিৎসা বলা হয়েছে।

অসুখ করলে ওষুধ ছাড়া সারবে না এমন নয়। সুস্থ থাকার জন্যে শরীরের মধ্যেই অত্যন্ত শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা আছে। তাছাড়া দৈনন্দিন ক্ষয় পূরণ ও মানসিক স্থিরতা বজায় রাখার জন্যেও কিছু ব্যবস্থা আছে। শরীরের নিজস্ব ব্যবস্থার জন্যে রোগ-জীবাণু সংক্রমণ ঘটে না বা ঘটলেও সেই ব্যবস্থার জন্যেই দেহ রোগ মুক্ত হয় (ব্যতিক্রম এইড্স ভাইরাস এবং হেপাটাইটিস-বি ভাইরাস)। শরীরের নানা রকম গোলমালও আপনা থেকেই সেরে যায়। আবার হাম, বসন্ত, ইনফ্লুয়েঞ্জা, জল বাহিত জন্ডিস, পোড়াবাদরার মতো অনেক স্বসীমিত অসুখ নির্দিষ্ট সময়ের পর সেরে যায়। এ সবের জন্যে কোনো ওষুধের প্রয়োজন হয় না। এ বিষয়টি অনেকের অজানা; আবার যাঁদের জানা তাঁরাও ঠিক ভরসা রাখতে পারেন না। অসুখ হলেই তাই ওঝা, গুণিন, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, কবিরাজ এবং আধুনিক চিকিৎসকের কাছে যে যাঁর বিশ্বাস মতো গিয়ে হাজির হন। সব ক্ষেত্রেই অসুখ সারে তার নিজস্ব নিয়মে, কিন্তু যে যা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন সেটিকেই সঠিক মনে করেন। এখানেই বোঝার ভুল হচ্ছে। বছর পাঁচেক আগে কম্পিউটারে মাউস ব্যবহার করে দিনে ৪-৫ ঘণ্টা কাজ করার ফলে আমার ডান হাতের কবজিতে সুপারির মতো বড় গ্যাংলিওন হয়েছিল। ডাক্তারের কাছে যেতে, উনি সব দেখে শুনে কম্পিউটারের কাজ কমাতে বললেন, মাস দুই পর আবার দেখাতে বললেন। দুমাস পর দেখে উনি অপারেশনের কথা বলেন এবং তার প্রস্তুতিও নেওয়া হলো। কিন্তু কোনো কারণে সে সময় অপারেশন স্থগিত রাখতে হয়। দুমাস কেটে যায়। কম্পিউটারের কাজও তার মধ্যে কমে গেছে এবং কবজির ফোলাটাও ছোট হতে শুরু করেছে। সে কথা ডাক্তারবাবুকে জানাতেই বললেন খুব ভাল খবর, অপারেশন করতে হবে না, এমনি সেরে যাবে। ঐ সময় কেউ কেউ আমাকে বলেছিলেন হোমিওপ্যাথিতে এর খুব ভাল ওষুধ আছে। কিন্তু আমি কোনো কিছু করিনি। কবজির ফোলা অংশ এমনিতেই সেরেছে। আমি যদি তখন হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী ওষুধ ব্যবহার করতাম বা অপারেশন করতাম, তাহলে মনে হতো ঐ চিকিৎসাতেই রোগ সেরেছে। অথচ রোগ সেরেছে শরীর সুস্থ থাকার নিজস্ব ব্যবস্থায়। ওষুধে কোনো কাজ হোক বা না হোক, অনেক ক্ষেত্রেই রোগ সারার কারণ শরীর সুস্থ রাখার জন্যে প্রতিটি কোষের অবিরাম সংগ্রাম।

আধুনিক চিকিৎসার তুলনায় ভেষজ চিকিৎসায় ঝামেলা কম, খরচ কম এবং ভেষজ ওষুধ প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি বলে এর প্রতি মানুষের এতো আগ্রহ। তবে এগুলিই প্রধান কারণ নয়।

অধিকাংশ মানুষ গাছ-গাছড়ার দৈবশক্তিতে বিশ্বাসী, 'ম্যাজিকে' বিশ্বাসী। সেই কারণে হাতে, কোমরে গাছ-পালার অংশ বেঁধে রোগ সারাতে আগ্রহী মানুষের সংখ্যাও কম নয় এবং তারও একটা বাজার আছে। সে যাই হোক, অধিকাংশ মানুষের এই দুর্বলতার সুযোগে কিছু লোকজন, কিছু প্রতিষ্ঠান ভেষজ পদার্থ নিয়ে চুটিয়ে ব্যবসা করছে। আর ভেষজ ওষুধ যেখানে কোনো 'ভেকধারী সাধু' বা 'বাবা' দিচ্ছেন সেখানে মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন; প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে সেখান থেকে চড়া দামে ওষুধ কিনছেন। ওষুধে ছাইভস্ম কী থাকে সে সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। কিন্তু প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ এভাবে প্রতারিত হচ্ছেন।

ভারতের মতো দেশগুলি বিপুল পরিমাণে ভেষজ ওষুধ তৈরি করে। বহুক্ষেত্রে সে সব ওষুধের গুণমান ঠিক থাকে না। যে গাছের উপাদান বলে বিক্রি হয় ওষুধে আদৌ তা থাকে না কিংবা তার সঙ্গে অন্য গাছ-গাছড়ার উপাদান মিশে থাকে। আবার কোথাও পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়ামের মতো ক্ষতিকর ধাতু মিশে থাকে। ধাতুগুলির রোগ সারানোর ক্ষমতা আছে, এই বিশ্বাসে সে সব মেশানো হয়। এতে মানুষ যে শুধু প্রতারিত হয় তা নয় ধাতুর বিষক্রিয়ায় অনেক সময়ই শরীরে জটিল সমস্যার সৃষ্টি হয়। আমার এক আত্মীয়, সুস্থ সবল যুবক, এখন বয়স চল্লিশ বছর। বছর পাঁচেক আগে চন্ডীগড়ে থাকার সময় হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয় এবং হাসপাতালে থাকতে হয় অনেক দিন। প্রথমে তো কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছিল না। তারপর অনেক পরীক্ষা করে ধরা পড়ে সীসার বিষক্রিয়ার জন্যে এমন হয়েছে। সুস্থ হবার পর জানা যায় ও একটা ভেষজ ওষুধ খায় তার থেকেই এই বিষক্রিয়া হয়েছে।

ভেষজ ওষুধ আর এক রকমের ধোকাবাজি হলো গাছ-গাছড়ার উপাদানের সঙ্গে আধুনিক চিকিৎসায় ব্যবহৃত বেদনানাশক, জ্বর উপশমের ওষুধ, স্টেরয়েড, অ্যান্টিবায়োটিক, রক্তের শর্করা কমানোর ওষুধ ইত্যাদি মেশানো। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তৈরি ৪০ শতাংশ ভেষজ ওষুধের মধ্যে এসব মেশানো থাকে। এ ক্ষেত্রেও মানুষ প্রতারিত হচ্ছে এবং সমস্যায় পড়ছে।

অনেকেরই মনে হতে পারে এ রকম চলছে কী করে? এসব নিয়ন্ত্রণের কি কোনো আইন নেই? সারা বিশ্বে ভেষজ দ্রব্যের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই বলাই ভালো। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী যে অনুসন্ধান করেছে, তাতে ৭০টি দেশে ভেষজ ওষুধ সংক্রান্ত জাতীয় নীতি আছে, এমন কথা বলা হয়েছে। কিন্তু জার্মানিসহ ইউরোপের কয়েকটি দেশ ছাড়া কোথাও ভেষজ দ্রব্যের গুণমান, কার্যকারিতা এবং নিরাপদ কিনা সে বিষয়ে কোনো পরীক্ষা নিরীক্ষা হয় না। আমেরিকা তাদের ১৯৯৪ সালের ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট অ্যান্ড হেলথ এডুকেশন অ্যাক্ট-এ গাছ-গাছড়া থেকে উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রে এ সব পরীক্ষা ছাড়াই বাণিজ্য করার অনুমতি দিয়েছে। ভারতের ভেষজ ওষুধ সম্পর্কে

জাতীয় নীতি কিছুটা আধুনিক ওষুধ নীতির মতোই এবং এই নীতি প্রণয়ন হয়েছিল ১৯৪০ সালে। পরে ১৯৬৪, ১৯৭০ এবং ১৯৮২-তে তা সময়োপযোগী করা হয়। কিন্তু আয়ুর্বেদ, ইউনানি ও সিদ্ধ প্রথায় বহুদিন থেকে ব্যবহার আছে বলে ভেষজ ওষুধের গুণমান, ক্ষতিকর প্রভাব, কর্মক্ষমতা এবং নিরাপদ কিনা সেসবের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। আর থাকলেই বা দেখছে কে?

রোগ নিরাময়ে ভেষজ ওষুধ প্রয়োগ ছাড়া যকৃৎ ভাল রাখতে, বুদ্ধি বাড়াতে, মোদ কমাতে, দেহের বল বৃদ্ধি করতে, বার্ধক্য বিলম্বিত করতে, যৌবন ধরে রাখতে, যৌনক্ষমতা বাড়াতে, টাকে চুল গজাতে, ত্বক ভাল রাখতে এবং রূপচর্চায় বিপুল পরিমাণ ভেষজ দ্রব্য ব্যবহার করা হয়। অপ্রয়োজনীয় ও অযৌক্তিক সে সব দ্রব্য ব্যবহারের কোনো মানে হয় না। কিন্তু বিজ্ঞাপনের চমকে বিভ্রান্ত মানুষ সেগুলি কিনছে। তাই কাজ হোক আর না হোক ভেষজ দ্রব্যের চাহিদা প্রচুর। বিশ্বজুড়ে তার রমরমা বাজার এবং সেসব পণ্যের মুখ্য অংশই আসে প্রকৃতি থেকে। চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অকারণে চলছে প্রকৃতি লুণ্ঠন। ফলে বেশ কিছু উদ্ভিদ প্রকৃতি থেকে হারিয়ে গেছে, অনেকের অস্তিত্ব বিপন্ন। প্রকৃতি থেকে ভেষজ উদ্ভিদ সংগ্রহের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ থাকা খুবই জরুরী। কিন্তু সেটা করবে কে?

তথ্যসূত্র :

১। Herbal Medicines - p. 2502, Nelson Text Book of Pediatrics (17th Edn.) ২। Herbal Medicine - University of Maryland Medical Centre. www.umm.edu ৩। Herbalism - en.wikipedia.org ৪। Alternative Medicine -en.wikipedia.org ৫।Medicinal Plants of India - medicalpltsinindiamp.blogspot.com ৬। National Policy on Traditional Medicine and Regulation of Herbal Medicine - Report of a WHO Global Survey. app.who.int ৭। মানুষের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা —সুনীতিকুমার মণ্ডল, প: ব: রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

উমা

ভাই-এর চোখে দাদা বনবিহারী

সমীরকুমার ঘোষ

পূর্বপ্রকাশিতের পর

বনবিহারীর মতো এক বিরল-চরিত্র মানুষের কথা মানুষ জানুক, তাঁর লেখাগুলি সবাই পড়ুক, কদর করুক — এই চেষ্টাটা সারাজীবনই করে গিয়েছেন পরিমল গোস্বামী। বনবিহারীও খুব স্নেহ করতেন তাঁকে। তাই ৫-১২-৫৯ তারিখে একটি চিঠিতে পরিমলবাবুকে লিখেছিলেন, '... আমি কিছু সঞ্চয় রাখি না। রাখবার আধারও নেই। অফিসিয়াল খামের পিছনে অর্ডিনারি কালি কলম দিয়ে ছবি এঁকে ছড়িয়ে দিয়েছি। পয়সা চাই নি, অ্যাপ্রিসিয়েশনও ভরসা করিনি।' এর পরে ৯ ডিসেম্বর তারিখে আরেক চিঠিতে লেখেন, 'তোমার লেখা পড়ে তোমাকে আমার সগোত্র বলে মনে হয়েছে। তোমার মতামতকে আমি অত্যন্ত মূল্যবান মনে করি। আমার সমস্ত লেখা (অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ) তোমার হাতেই দিয়ে নিশ্চিন্ত হলুম। এদের সম্বন্ধে তুমি যা করবার করো। কোন্‌টা ছাপবে কোন্‌টা ফেলবে তা তোমার বিচারের ওপর ছেড়ে দিলুম।'

'বেপরোয়া' পত্রিকায় বনবিহারীর অস্বাক্ষরিত সব লেখাই পরিমলবাবু চিহ্নিত করে রেখেছিলেন। 'শনিবারের চিঠি' ও অন্যান্য জায়গায় প্রকাশিত লেখাগুলোর এক তালিকাও তৈরি করেছিলেন। বনবিহারীর আত্মীয়পরিজন ও পরিচিতদের চিঠি লিখে তাঁর সম্বন্ধে যতটা সম্ভব জানার চেষ্টা করেছেন। বনবিহারীর পরের পরের ভাই ছিলেন বিজনবিহারী। তাঁর কাছে বনবিহারীর পারিবারিক পরিচয় ও পাঠ্যজীবন সম্পর্কে জানতে চেয়ে পরিমলবাবু যে চিঠি লিখেছিলেন, উনি গিরিডি থেকে তার উত্তর দেন ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬। পরিমলবাবুর পুত্র হিমানীশ গোস্বামীর কন্যা হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে সেই চিঠিখানি পেয়েছি। ব্যক্তি বনবিহারী সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানা যায় না। তাই বিজনবিহারীর কিছু কিছু অংশ পাঠকের সামনে তুলে ধরা দরকার। বিজনবিহারী জানাচ্ছেন —'আমাদের অর্থাৎ বনবিহারীর আদি বাসস্থান গরলগাছায়। এই ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রামটি হুগলি জেলার শ্রীরামপুর সাব ডিভিশনের অন্তর্গত, জনাই ও চণ্ডীতলার সন্নিকটে —কলকাতা থেকে ৮-৯ মাইল দূরে।

আমাদের প্রপিতামহ ঁগোলকচন্দ্র, একজন ধনী, প্রতিষ্ঠাশালী ও প্রতাপশালী লোক বলে পরিচিত ছিলেন। পিতামহ ঁআনন্দচন্দ্র। এবং আমাদের পিতা ঁবিপিনবিহারী ঁআনন্দচন্দ্রের মধ্যম পুত্র। তিনি তাঁর শ্বশুরালয়ের গ্রাম বেহালায় নিজ গৃহ নির্মাণ করে সেইখানে বসবাস করেন এবং বনবিহারীর এনট্রান্স পরীক্ষার পূর্বেই সপরিবারে কলকাতায় এসে মৃত্যুকাল পর্যন্ত সেখানেই থাকেন। তাঁর পরবারবর্গ যথাক্রমে ব্রজবিহারী, বনবিহারী, সুধীরা, বঙ্কু বিহারী, শৈলবালা, বিজনবিহারী, বিমানবিহারী ও বিনোদবিহারী।

... তারিখ বেহালায়, পিত্রালয়ে বনবিহারীর জন্ম হয় এবং ছাত্র বৃত্তি পরীক্ষার পর তিনি কলকাতায়, আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় কিন্তু দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশায়ের (ঁহেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের) কাছে থেকে সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুল ও কলেজে পড়াশুনা করেন। তাঁর (প্রায়) নিঃসঙ্গ বাল্য ও কৈশোর জীবনের একমাত্র অভিভাবক ও বন্ধু ছিলেন ঐ বৈদান্তিক পণ্ডিত ও তাঁর এক বৃদ্ধা কুরূপা গোদা ঝি। বলা বাহুল্য তিনি বরাবরই কৃতী ও মেধাবী ছাত্র ছিলেন। বোধহয়, তিনি ১৯০৫-এ এন্ট্রান্স, ১৯০৭-এ এফ্ এ এবং ১৯১২-য় এম বি পাশ করে গভর্মেন্ট সার্ভিসে যোগ দেন। ছাত্রাবস্থায় অর্থাৎ সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলের ৫ম, ৪র্থ ও ৩য় শ্রেণীতে পাঠকালে তিনি আদ্য, মধ্য ও কবিতীর্থ পাশ করেন শুনেছি। সংস্কৃতে কবিতা লিখেছিলেন অনেক, তাও শুনেছি। ...এম বি পরীক্ষার পূর্বেই তাঁর বিবাহ হয় উমাশশী দেবীর সঙ্গে। উমাশশী শান্তিপুর নিবাসী ডাঃ যদুনাথ গাঙ্গুলির কন্যা এবং তিনি গোঁড়া হিন্দু ঘরের আচার নিষ্ঠার মধ্যে মানুষ হয়েছিলেন বলে আমাদের সংসারে বেশ সহজ হতে পারেন নি কিন্তু তিনি সেবাপরায়ণা ছিলেন।

বনবিহারী ১৯১৪ সালে বিলেত যান। কিন্তু যুদ্ধ লাগার ৪/৫ মাস পরেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়। ... আপনি দশচক্র পড়েছেন। এই বইয়ে আমাদের পারিবারিক জীবনের একটি অধ্যায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। উপন্যাসটির চিত্র ও চরিত্রগুলি প্রায় সত্য বলা যায়। এই উপন্যাসে শশী ও ভূপতির চরিত্রে বনবিহারী আত্মপ্রকাশ করেছেন বিশেষ ভাবে নয় —স্বভাবেই।

বগুড়ায় সিভিল সার্জন থাকা কালে July 39 এ তাঁর পত্নীবিয়োগ হয়। সেইখান থেকেই তিনি কিছু early retire করে

কলকাতায় আসেন এবং তাঁর দুটি অবিবাহিত কন্যার বিবাহ হয়ে গেলে ১৯৪৫/৪৬ সাল থেকে তাঁর বানপ্রস্থ জীবন শুরু হয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি পুত্র কন্যা আত্মীয় স্বজন কারুর কাছেই বসবাস করতে রাজি ছিলেন না। বনবিহারী এবং বঙ্কুবিহারী দুই ভাই এইরূপ বানপ্রস্থ জীবনে প্রায় ২০ বছর কাটিয়েছেন — কেন জানি না। মৃত্যুকালে তিনি এক পুত্র, পুত্রবধূ, তিন কন্যা জামাতা ও কয়েকটি নাতি নাতনি রেখে গেছেন।'

বিজনবিহারীর চিঠি থেকে পাওয়া বনবিহারী সম্পর্কিত তথ্য এটুকুই। বনবিহারীর বানপ্রস্থ সম্পর্কে মুজতবা আলীর বক্তব্যটা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

মুজতবা লিখছেন— 'বনবিহারীর পূর্ণাঙ্গ জীবনী লেখা প্রায় অসম্ভব, কারণ চাকরিজীবনে তাঁকে বাধ্য হয়ে আজ পাকশী, কাল মৈমনসিং, পরশু বগুড়া করতে হয়েছে— এবং অসময়ে বেকসুর বদলি হলেও তিনি হয়তো প্রতিবাদ জানাতেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো মেহেরবাণী চাইতেন না। বনবিহারী এ জীবনে কারো কাছ থেকে কোনো 'ফেবার' চান নি, এবং ভগবানের কাছ থেকে অতি অবশ্য, নিশ্চয়ই না। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি সর্বপ্রথম কোথায় যান জানি নে, কিন্তু তার পরই চলে যান দেরাদুনে। সেখানে বেশ কয়েক বৎসর একটানা হোটেলে বাস করার পর হঠাৎ চলে যান —বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, আন্দামান। স্বেচ্ছায় এবং অতিশয় প্রসন্ন চিত্তে। বলা বাহুল্য, সেখানে রোমান্সের সন্ধানে যান নি। কাব্যে, সাহিত্যে তিনি কতখানি রোমান্টিসিজম বরদাস্ত করতেন বলা কঠিন, কিন্তু সংসার-জীবনে তিনি রোমান্টিসিজমের পিছনে দেখতে পেতেন, make belief, সত্য থেকে আত্মগোপন, এস্‌কেপিজম এবং ভণ্ডামি এবং এর সব কটাকেই তিনি অত্যন্ত ভ্রূকুটিকুটিল নয়নে তিরস্কার জানাতেন। তারপর হঠাৎ একদিন তিনি আবার ভারতে ফিরে এলেন। বৃদ্ধ বয়সে তাঁর বাসস্থান পরিবর্তন আমাকে বড় পীড়া দিত। তাই তাঁকে অনুরোধ জানালুম, তিনি যেন দয়া করে আমার সঙ্গে বসবাস করেন। উত্তম হক মধ্যম হক, আমি মোগলাই, বিলিতি কিছু কিছু রাঁধতে পারি; সে সময়ে আমার বাসস্থানটি ছিল প্রশস্ত ও নির্জনে— শ্মশানের কাছে অবস্থিত। আমার নিজস্ব বই তো ছিলই, তদুপরি তাঁর পরিচিত একটি লাইব্রেরি কাছেই ছিল। অবশ্য সর্বপ্রধান প্রলোভন ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুত বিনোদবিহারী মুখুয্যে। তাঁর বাসাও নিকটে। এই ভাইটিকে বনবিহারী আপন হাতে মানুষ করেন এবং সে যেন ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল, উপাসনা ইত্যাদি সর্বপ্রকার সংস্কার থেকে মুক্ত থাকে সেজন্য কোনো ব্যবস্থার ত্রুটি করেন নি। বিনোদবিহারীর ডাক নাম 'নন্তু'। বনবিহারী তাকে ডাকতেন 'নাস্তিক' বা 'নাস্তে'। আমার বাড়িতে এসে বাস করলে তিনি যে তাঁর নাস্তেকে অক্লেশে দু'বেলা দেখতে পাবেন সেইটেতে বিশেষ জোর দিয়ে আমি আমার চিঠিতে নিবেদন জানিয়েছিলুম। বিনোদবিহারী প্রায় দশ বৎসর পূর্বে তাঁর চোখের জ্যোতি সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেন; তাই তাঁর পক্ষে অগ্রজ সন্নিধানে যাওয়া কঠিন ছিল।

আমি ক্ষীণ আশা নিয়েই আমন্ত্রণ জানিয়েছিলুম, কারণ তাঁর কৃতবিদ্য, বিত্তশালী, পিতৃভক্ত পুত্রকে উত্তম রূপেই চিনি। তাঁর শত কাতর অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি পুত্রের গৃহে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে রাজি হন নি। আমার আশা ছিল, আমি তাঁর কেউ নই। তিনি জানতেন যে আমি ধর্মে, সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী একটা আস্ত জড়ভরত হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে অবিচল ভক্তি করি, এবং দাসের মত সেবা করবো; বিশ্বসংসার নিয়ে তাঁর যতরকমের সমালোচনা, ব্যঙ্গবিদ্রূপ আমি সহাস্য বদনে শুনেছি এবং শুনবো এবং তর্কযুদ্ধ করার মত লোকের অভাব হলে আমাকে দিয়েও কিছুটা কাজ চলবে — তিনি জানতেন, আমার জীবন কেটেছে 'তুলনাত্মক ধর্ম' চর্চায়।

তিনি এলেন না সত্য। কিন্তু আমাকে একটি অতিশয় প্রীতিপূর্ণ (তিনি সেন্টিমেন্টের আতিশয্য এতই অপছন্দ করতেন যে, সেফ্‌সাইডে থাকার জন্য সেটা বাক্যে, পত্রে সর্বত্র বর্জন করতেন) পত্র লিখে জানালেন, 'তোমার নিমন্ত্রণ মনে রইল, সময় হলেই আসবো।'

আমার ক্ষোভ-শোকের অন্ত নেই যে তাঁর সময় আর হল না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দি, আমি কে যে তিনি আমার সেবা গ্রহণ করে আমাকে ধন্য করতেন।'

মুজতবা আলীর মতো অত জ্ঞানী এবং গুণী মানুষ বনবিহারীকে কতখানি শ্রদ্ধা করতেন এটুকু পড়লেই সেটা বোঝা যায়।

মুজতবা আলীর বনবিহারী-মুগ্ধতা অবশ্য কিশোর বয়স থেকেই। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, 'এই যে সামান্য আমি, আমার বয়েস কত হবে? ষোলগোছ, — আমাকে পর্যন্ত প্রথম দর্শনের পাঁচ মিনিটের ভিতর, কলার অভাবে কুর্তার গলার মুরী ধরে শুধোলেন, 'তুমি ঈশ্বর মানো?'

আমি ভীত কণ্ঠে বললুম, 'আজ্ঞে আমার বিশ্বাস দৃঢ় নয়, অবিশ্বাসও দৃঢ় নয়।' আমি তখন জানতুম না, এই উত্তরই চার দশক পরে কলকাতার মডার্ন মহিলাদের ভিতর ফ্যাশন হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বিশ্বাস দৃঢ়ই হক, আর শিথিলই হক, সেইটে কিসের উপর স্থাপিত আমাকে বুঝিয়ে বলো।'

কী যুক্তি দেব আমি? যেটাই পেশ করি, সেটাই বুমেরাঙের মত ফিরে আসে ফের আমারই গলায়। ইতিমধ্যে আমার জন্য উত্তম মমলেট, ঘোলের শরবৎ এসেছে — দুপুর অবধি তর্ক চালালে অবশ্যই পুঁই-চচ্চড়ি আসতো!

আমি রণেভঙ্গ দিতে চাইলেও তিনি ছাড়েন না। আমি যে ধর্মের 'অধর্ম' পথে চলেছি সেইটে তিনি সপ্রমাণ করতে চান, সর্বদৃষ্টিকোণ থেকে, সর্বদৃষ্টিবিন্দু থেকে। এবং আমার সবচেয়ে বিস্ময় বোধ হল যে, আমি যে ক'জন ইয়োরোপীয় নাস্তিক দার্শনিকের নাম জানতুম —অবশ্য অত্যন্ত ভাসা-ভাসা ভাবে — তাঁদের কাছ থেকে বনবিহারী ঈশ্বরঘ্ন, ধর্মঘ্ন যুক্তি আহরণ করলেন না। বিস্তর তর্কজাল বিস্তৃত করার পর, মাঝে মাঝে তিনি সেগুলো সাম্ আপ্ করতেন, এ-দেশী পরিভাষায় সূত্ররূপে প্রকাশ করতেন সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করে! এই প্রথম আমার গোচরে এল যে, আর্যাবর্তের মত ধর্মাবর্তের দেশেও অসংখ্য নাস্তিক প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধে বহুযুগ পূর্বেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে গিয়েছেন।'

বনবিহারী তাঁর ধর্মভাবনার কথাই লিখে গিয়েছিলেন 'দশচক্র' বইটিতে। সেটি এখন পাওয়া যায় না। পরিমলবাবু তাঁর লেখায় আরও খানিকটা উদ্ধৃত করেছেন। সেটুকুও তাই উল্লেখ করা প্রয়োজন —

'এত বড় দেশের মধ্যে এই ছোট মানুষটির দাঁড়াইবার স্থান কি কোথাও নাই? নিশি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল সমাজের লোকের সহিত ... আলোচনা করিয়া এটুকু বুঝিয়াছে যে, সে যদি আজ মুখে বলে যে, খ্রীষ্ট বা মহম্মদ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, আর কেহ পারেন না, তবে হাজার হাজার লোক পাওয়া যাইবে, যাহারা ছুটিয়া আসিয়া ইহাকে কোলে তুলিয়া লইবে। কিন্তু সে মানুষ বিপদে পড়িয়াছে — কেবল এই কারণে কেহ তাহাকে আশ্রয় দিবে না। সে যদি আজ দেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, ত ক্রয় করিবার লোকের অভাব হইবে না। সমাজের শিরোনামণিরাও তখন দলে দলে আসিবেন, টং করিয়া টাকা ফেলিবেন, ইহার গা ঘেঁষিয়া বসিয়া যাইবেন। ইহাকে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধসভার বুকের উপর নাচাইবেন। ইহার রাঁধা ভাত ... নিরুদ্বেগে উদরসাৎ করিবেন। কিন্তু এ যে দেহটাকে অস্পৃষ্ট রাখিতে চাহিতেছে। ভোগ্যবস্তুর এ স্পর্ধা সমাজ সহ্য করিবে কেন?' ...

এই যে প্রশ্ন, এর মধ্যে বেদনা কি পরিমাণ ফুটেছে তা অতি স্পষ্ট। বনবিহারী এ দেশের মেয়েদের অসহায়তার যে তীব্র বেদনা বোধ করেছেন, তার প্রমাণ তাঁর বহু রচনায়, কার্টুন ছবিতে। 'দশচক্র' উপন্যাসের ওই একই বেদনা এবং পুরুষের কাপুরুষতার বিরুদ্ধে তীব্র পরিহাস। আরো একটি নির্মম পরিহাসের ছবি দেখা যাবে তাঁর 'সিরাজির পেয়ালা' নামক ছোট উপন্যাসে। মেয়েদের অসহায়ত্বের এমন বিপ্লবাত্মক ছবি বাংলাভাষায় এ পর্যন্ত রচিত হয় নি —মন্তব্য করেছেন পরিমল গোস্বামী। এই মন্তব্যে এতটুকু অতিশয়োক্তি নেই। (আগামী সংখ্যায়)

উমা

প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি শেখানোই জরুরি

সন্দীপ সিংহ

বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানে এখন প্রগতির প্রবাহ বিশ্বজুড়ে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে এখন যন্ত্রের প্রভাব প্রবল। যন্ত্র ছাড়া চিকিৎসা হয় না। পাড়ায় পাড়ায় ইনটেনসিভ থেরাপির পরিকাঠামো হলেই ভাল হয়। অসংখ্য রোগনির্ণয় কেন্দ্র গড়ে উঠছে মানুষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ ও মুনাফার আশায়। আমাদের দেশে এক চতুর্থাংশ মানুষ আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। কমবেশি ৩০ কোটি মানুষের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ নিজের উপার্জনের অর্থে ওষুধ কিনতে পারেন। শিক্ষার অধিকার আইন পাশ হয়েছে স্বাধীনতার ৬২ বছর পরে, যদিও সর্বজনীন স্বাস্থ্যের অধিকার দেওয়া হয়নি এখনো। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রস্তাব করা হয়েছে ২৮,৫৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের কেবল হেলথ কেয়ারের জন্য। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্যসচেতনতা প্রসারিত করতে নানা পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী দশ বছরের মধ্যে 'নির্মল ভারত অভিযান' প্রকল্পের দ্বারা ভারতকে open-defecation free country-তে পরিণত করবেন বলে ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী। ইতিমধ্যে গ্রামাঞ্চলে আমাদের রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ও স্বাস্থ্য সচেতনতার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। প্রগতি নিশ্চয়ই হয়েছে। বিশ্বায়নের আর্থ-সামাজিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে চিকিৎসা বিদ্যার দর্শনও বদলেছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি মানুষ এখনো অবচেতনে বদ্ধ হয়ে আছে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও অস্বাস্থ্যকর আচার অভ্যাসে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে অসচেতনতার কতকগুলি বিষয় আলোচনা করলে এ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান কোন পর্যায়ে তা বোঝা যাবে।

গ্রামাঞ্চলে ২০০৮ সাল পর্যন্ত প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণের কর্মসূচি গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি বাস্তবায়িত করতে পারে নি। এরপর থেকে নির্মল পঞ্চায়ত স্বীকৃতি পাওয়ার একটা উদ্যোগ দেখা যায়। প্রথম দিকে শৌচাগার নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কেই ধারণার অভাব ছিল প্রবল। গ্রামের বহু মধ্যচাষী পরিবারেও শৌচাগার ছিল না। স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে এবং শিক্ষার আঙিনায় বেশিরভাগ পরিবারের ছেলেমেয়েদের প্রবেশের পরে শৌচাগার নির্মাণের সক্রিয় প্রচেষ্টা শুরু হয়। বছর পাঁচেক আগেও গ্রামের রাস্তা দিয়ে হাঁটা যেত না

মলমূত্রের দুর্গন্ধের জন্য। খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করাটাই ছিল স্বাভাবিক অভ্যাস। বর্ষাকালে ভয়াবহ চিত্র দেখা যেত। ফাঁকা জমি প্রায়ই থাকতো না। ফলে পাটজমির ভিতরে, ঘাসভর্তি জমির আলের উপর মলত্যাগ করা ছাড়া উপায় থাকতো না। এখন সেই করুণ চিত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তবুও সাফল্য কিন্তু একশো শতাংশ নয়। বহু গ্রাম পঞ্চায়েত সুলভে সরকারি অর্থসাহায্যে প্রতিটি বাড়িতে শৌচাগার নির্মাণের কর্মসূচি রূপায়ণে যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েত 'নির্মল গ্রাম পঞ্চায়েতের' তকমা ও পুরস্কার লাভও করেছে। কিন্তু নির্মল পরিবেশ সর্বত্র বিরাজ করছে না। স্বল্প টাকায় নির্মিত দরমা দ্বারা বেষ্টিত শৌচালয়গুলি সকলেই যে ব্যবহার করছে তা নয়। প্রথমত, নিম্নমানের পরিকাঠামোর ফলে সেগুলি বেশিদিন ব্যবহার করা যায় না। দ্বিতীয়ত, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাবে অনেক পরিবার সেগুলি ব্যবহারও করে না। অনেকে সেই ছোট্ট ঘরটিকে কাঠ-ঘুঁটে রাখার জন্য ব্যবহার করছে আবার বহু ক্ষেত্রে ইঁদুর মহানন্দে মাটি ফেলে ভর্তি করে ফেলেছে। দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকায় ৭/৭/১২ তারিখে একটি সংবাদে এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী জয়রাম রমেশ যে তথ্য তুলে ধরেছেন তা খুবই বাস্তব। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড প্রভৃতি রাজ্যের তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেছেন, সরকারি অর্থসাহায্যে নির্মিত শৌচাগারগুলি শৌচকার্যের জন্য ব্যবহার না করে বেশিরভাগ ফসল রাখার গুদাম হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেছেন, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িষ্যার মতো বড় রাজ্যগুলি আগামী ১৫-২০ বছরের মধ্যেও খোলা মাঠে মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস বন্ধ করতে পারবে না। কেন্দ্রীয় সরকার শৌচাগার নির্মাণের জন্য সহায়তা বাবদ অর্থ ৩৫০০ টাকা বাড়িয়ে ১০,০০০ টাকা করেছেন। আমাদের রাজ্যেও প্রকৃত চিত্র সরকারি সমীক্ষায় উঠে আসে না। পাঞ্জাবের মতো আমাদের গ্রামাঞ্চলেও সুলভে নির্মিত শৌচাগারগুলি সঠিক কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে না বহু ক্ষেত্রে। গ্রামে এমন বহু পরিবার আছে যাদের বাড়িতে রঙিন টিভি আছে, একাধিক মোবাইল ফোন আছে, কিন্তু স্বাস্থ্যসম্মত বা ব্যবহারোপযোগী শৌচাগার নেই। এখনো বহু মানুষকে দেখা যায় কানে মোবাইল ফোন নিয়ে খোলা স্থানে মলত্যাগ করে পরিবেশ দূষিত করছেন।

গ্রামে বিশুদ্ধ পানীয় জলের উৎস বেশিরভাগ মানুষের কাছে পঞ্চায়েত নির্মিত নলকূপের জল অথবা নিজ ব্যয়ে নির্মিত নলকূপের জল। এই জল যে কতটা বিশুদ্ধ তা পরীক্ষা করে দেখার কোন ব্যবস্থা নেই। বহু এলাকায় আর্সেনিক ধরা পড়েছে অনেক মানুষ দীর্ঘদিন ধরে আর্সেনিকঘটিত রোগভোগ করার পর। সরকারি উদ্যোগে সাধারণভাবে নলকূপগুলির জল দূষণের পরীক্ষা করার কোনো ব্যবস্থা নেই। এখনো বহু এলাকায় বিশেষত অনগ্রসর শ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলে মানুষ পুকুরের জলকেও ব্যবহার করেন রান্নার কাজে। নলকূপে জলে ভাত রান্না করলে ভাত ভাল সেদ্ধ হয় না, তাই পুকুরের জলই অনেকের প্রিয় রন্ধন কাজে। এই কারণে গ্রামাঞ্চলে অপুষ্টিজনিত অসুখের থেকেও জলবাহিত রোগের প্রকোপ অনেক বেশি।

গ্রামাঞ্চলে সুসংহত শিশু বিকাশ প্রকল্প বা আই সি ডি এস থেকে শুরু করে প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিদ্যালয়গুলিতে শিশুদের মধ্যে ও ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে সচেতনতা, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, শৌচাগারের সুযোগ ইত্যাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধ বিষয়গুলি কিছুটা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। প্রথমেই আলোচনা করা যাক আই সি ডি এস কেন্দ্রগুলি সম্পর্কে। গ্রামে প্রাক্ প্রাথমিক স্তরে শিশুদের এবং গর্ভবতী মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য পরিবেশন করা, শিশু ও তার মায়েদের সাধারণ স্বাস্থ্যবিধি, রোগ প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করা এবং তার সঙ্গে শিশুদের খেলা ও আনন্দের সঙ্গে প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি শিখতে সাহায্য করার লক্ষ্যেই এই কেন্দ্রগুলি তৈরি হয়। ১০০০ জনসংখ্যা পিছু একটি কেন্দ্রের জন্য একজন কর্মী ও একজন সহায়িকা নিয়োগ করা হয়। কিন্তু গোড়ায় গলদ থাকায় এই প্রকল্পটিকে খিচুড়ি বিতরণের কেন্দ্র হিসাবেই চলতে হচ্ছে। কারণ প্রায় ৭০ শতাংশ কেন্দ্রের কোনো নিজস্ব গৃহ বা কেন্দ্র নেই। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবনের মধ্যেই চলে অথবা অনেক ক্ষেত্রে কোনো ক্লাব সংগঠনের ছোটঘরে বা গ্রামে কোনো পরিবারের চালাঘরে বহু রকমের অসুবিধা নিয়ে কেন্দ্রগুলি চলে। যেখানে প্রধানত রান্না করা পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার কাজটাই গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে এদের নিজস্ব গৃহ না থাকাটা এই প্রকল্পের ব্যর্থতার প্রমাণ। শিশুদের বসার জন্য এমন কি খেলাধূলার জন্য উপযুক্ত জায়গার অভাব বহু কেন্দ্রে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের পৃথক কোনো ব্যবস্থা নেই। নিকটবর্তী পঞ্চায়েতের কোনো নলকূপের জলই ভরসা। খাওয়ানোর আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কোনো ব্যবস্থা এখনো নেই। দিদিমণিদের পক্ষে অনেক সময় সকল শিশুর থালা ও হাত ভাল করে ধুয়ে দেওয়াও সম্ভব হয় না। অনেক কেন্দ্রে প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থা নেই। অনেক দূর থেকে রান্নার জন্যই জল আনতে হয়। সাধারণভাবে শিশুরা খোলা জায়গায় মলমূত্র ত্যাগ করতেই অভ্যস্ত। কারণ এদের নিজস্ব কেন্দ্র ছাড়া অন্য কেন্দ্রগুলিতে আলাদা করে শৌচাগারের ব্যবস্থাই নেই। শিশুকাল থেকেই এদের নানা কু-অভ্যাস গড়ে উঠেছে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর অভাবে। প্রতিটি কেন্দ্রই যেহেতু দুইজন মহিলা দ্বারা পরিচালিত, অথচ দিদিমণিদের জন্যও শৌচাগারের কোনও সংস্থান নেই। যেহেতু স্বাস্থ্যের অধিকার এখনো আমাদের নাগালের বাইরে তাই এরকম একটি সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব বা

শৌচাগার না থাকার বিরুদ্ধে কোনও সামাজিক চাপ বা আন্দোলন কিছুই নেই। এগুলি এখনো সমস্যা বলেই ভাবনার মধ্যে নেই কোনো স্তরেই।

সর্বশিক্ষা মিশনের অধীনে ইদানিং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিকাঠামো যথেষ্ট উন্নত হয়েছে ও হচ্ছে। উচ্চ প্রাথমিক স্তরেও পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে বিদ্যালয়গুলিকে। প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বেশ কয়েক বছর যাবৎ শুরু হয়েছে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে রান্না করা পুষ্টিকর খাবার দেওয়ার যজ্ঞ। এর জন্য বরাদ্দ পড়ুয়া পিছু জ্বালানি খরচসহ ৪.৩৩ টাকা উচ্চ প্রাথমিক স্তরে এবং ৩.১৭ টাকা প্রাথমিক স্তরের জন্য। এ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার কোনো ব্যবস্থা নেই। আমার দেখা বহু বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের খাবার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। কতিপয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকগণ বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করেন। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বিপুল সংখ্যক পড়ুয়ার সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জলের ব্যবস্থাই নেই। মিড-ডে মিল বিদ্যালয়ে চালু করার জন্য স্থানীয় প্রশাসন থেকে যেভাবে চাপ দেওয়া হয় ভাল শংসাপত্র লাভের আশায় কিন্তু প্রশাসনের কোনো স্তরেই আর চিন্তাভাবনা বা পরিকল্পনা নেই। বিপুল সংখ্যক পড়ুয়ার হাত ধোয়া, থালা ধোয়া আবার অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজ শেষ করে শ্রেণীকক্ষে ফিরে যাওয়ার জন্য যে ধরনের পানীয় জলের ব্যবস্থা করার দরকার তার ব্যবস্থা হয় নি ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়ে। প্রশাসনের দায় তার এলাকায় ১০০ শতাংশ বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করা, না হলে ওপরওয়ালার বকুনি খাওয়া। কীভাবে রান্না হবে, কী জ্বালানীর ব্যবস্থা হবে, জল কোথায় পাওয়া যাবে, কোথায় বসে বা দাঁড়িয়ে পড়ুয়ারা খাবে এ সবের ভাবনা সব বিদ্যালয়-প্রধানের। আমার দেখা কোনো বিদ্যালয়েই স্বাস্থ্যবিধি মেনে হাত বা থালা ধোয়ার জন্য অর্থ বরাদ্দ বা বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ —কিছুই নেই। প্রাথমিক বা উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রে শৌচাগার থাকলেও তা ব্যবহারের পর পরিষ্কার করার নিয়মিত ব্যবস্থা নেই। বিশেষ করে শিশুকাল থেকে যথাযথভাবে শৌচাগার ব্যবহার করার অভ্যাস না থাকায় বেশিরভাগ পড়ুয়া এগুলি এতটাই নোংরা করে যা প্রতিনিয়ত পরিষ্কার করার কোনো সুযোগ বিদ্যালয়গুলির নেই। এখনো ৪০ শতাংশ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ভাল শৌচাগারের অভাব আছে।

গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়ারা পানীয় জলের জন্য বিদ্যালয়ের নলকূপের উপরই নির্ভর করে। বাড়ি থেকে জলের বোতলে জল আনছে এমন পড়ুয়ার সংখ্যা মাত্র ৫ শতাংশ। উচ্চ প্রাথমিক স্তরে বোতল নিয়ে আসার সংখ্যা ৬০ শতাংশ, যদিও বোতলগুলি স্বাস্থ্যসম্মত নয়। ৯৫ শতাংশ ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবহার করা বোতলের মধ্যেই জল আনে পড়ুয়ারা। বোতলগুলি দীর্ঘদিনের ব্যবহার করার ফলে স্বাভাবিকভাবেই জল দূষিত করছে অনেক বেশি। মাধ্যমিক স্তরে পরিবেশ বিজ্ঞান পড়ানো হয়। কিন্তু শ্রেণীকক্ষে যা পড়ানো হয় বাস্তবে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার কোনো কর্মসূচি থাকে না। তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তব চিত্রের মিল না থাকায় পরিবেশ বিজ্ঞান পড়াটা শুধু দায়সারা হয়ে উঠেছে। আসলে গ্রামাঞ্চলে পরিবার থেকেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যবিধি শেখানো তো হয়ই না বরং কু-অভ্যাসগুলি রপ্ত হয়। শুধু যে অর্থ নেই বলে এই কু-অভ্যাস তা সবক্ষেত্রে সত্য নয়। জনপিছু মোবাইল কেনার ক্ষমতা আছে অথচ তেমন পরিবারেই বড়রা শৌচকার্য করার পর মাটি দিয়ে হাত পরিষ্কার করেন এমন নজির ভূরি ভূরি। তাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ক্ষেত্রে আমরা হাসপাতালের শয্যা বাড়ানোর জন্য যতটা আন্দোলন করি কিন্তু রোগের উৎসমুখ বন্ধ করার জন্য মানুষকে সচেতন করার ও সুঅভ্যাস গড়ে তোলার জন্য ততটা ভাবিত নই। অথচ সকলকে বিশুদ্ধ পানীয় জল দেওয়া, শৌচাগারের ব্যবহার শেখাতে পারলে এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি শেখাতে পারলে ৮০ শতাংশ রোগের প্রকোপ কমে যাবে। এর জন্য দরকার —সমস্ত স্তরে যথাযথ পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন।

উ মা

অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়
স্মারক বক্তৃতা
বিষয় : 'এ উপমহাদেশে মেয়েরা কেমন আছে?'
বক্তা: শ্রীমতী স্বাতী ভট্টাচার্য
২৪ নভেম্বর, ২০১২,
শনিবার বিকেল ৫টা
বাংলা একাডেমি সভাঘর

ক্রমশ দুষ্প্রাপ্য সুচিকিৎসা

গৌতম মিস্ত্রি

জীবজগতের স্বাভাবিক নিয়মানুসারে প্রাণের সুরক্ষার জন্য বিভিন্ন বন্দোবস্ত আমাদের শরীরের মধ্যেই বর্তমান। যেমন ধরুন হাড় ভাঙলে সে আপনিই জোড়ে। চিকিৎসকের কাজ হল ভাঙা হাড়ের টুকরোগুলো যথাস্থানে ধরে রাখা। সর্দি-কাশি থেকে জণ্ডিস, সব ভাইরাসঘটিত রোগই একটু সময় দিলে সেরে যায়। আবার ধরুন যদি কোনো কারণে কারও রক্তচাপ কমে বিপদসীমার নিচে নেমে যায়, সে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। এতে তার হাড়গোড় ভাঙতে পারে অথবা মাথা ফাটতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিগত আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রেখে আমাদের বাঁচিয়ে রাখে। 'চিকিৎসা' আর 'সুচিকিৎসার' পার্থক্য এইটুকুই যে সুচিকিৎসা পদ্ধতিতে প্রকৃতিগত আত্মরক্ষার প্রচেষ্টাকে পূর্ণমাত্রায় সদ্ব্যবহার করার পরে বিজ্ঞানলব্ধ চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

গোটা দুয়েক অপব্যবহৃত চিকিৎসার উল্লেখ করি। প্রায়শই দেখি, আন্ত্রিক রোগে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার আর সদ্য আক্রান্ত অল্পমাত্রার উচ্চ রক্তচাপ রোগে রক্তচাপ কমানোর ওষুধের ব্যবহার। আন্ত্রিক রোগের জীবাণুকে আমাদের শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাই নির্মূল করে। সুচিকিৎসক কেবলমাত্র শরীরের জল আর লবণের মাত্রা রক্ষা করে। নিয়মিত শরীরচর্চা (দৈনিক তিন কিলোমিটার হাঁটা), তামাকের ব্যবহার বন্ধ করা, আর খাদ্যে লবণের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারলে ১০ থেকে ২০ মিলিমিটার পর্যন্ত রক্তচাপ কমিয়ে ফেলা যায়, ওষুধের প্রয়োজন হয় না।

এই সুচিকিৎসা কোনও গোপন বিদ্যা নয়। সব চিকিৎসকই সেটা কোনও না কোনও সময়ে শিখেছেন। সুচিকিৎসা পদ্ধতির অল্প ব্যবহার, অব্যবহার আর ক্রমাগত ওষুধ নির্মাণকারী সংস্থাগুলোর বিজ্ঞাপনের টানাপোড়েনে এর বিচ্যুতি ঘটছে মাত্র।

যে ভাবে আমরা এখন হৃদরোগের চিকিৎসা করছি, তাতে সমাজের বৃহদাংশের সুচিকিৎসা সম্ভব নয়। একটা কাল্পনিক গল্পের মাধ্যমে প্রসঙ্গটা ব্যাখ্যা করি। এক উচ্চশিক্ষিত সদ্য পাস করা নবীন চিকিৎসক নদীর পাড়ে হাওয়া খেতে গেছেন। হঠাৎ দেখেন, একজন মানুষ ভেসে যাচ্ছে। নদীতে ঝাঁপিয়ে তাকে তুলে, নিজের সদ্যপ্রাপ্ত চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগে তাকে সুস্থ করে তুললেন। এরপর কোনো আশ্চর্য কারণে এই ভেসে আসা মৃতপ্রায় মানুষের সংখ্যা বাড়তে লাগল। বুদ্ধিমান নবীন চিকিৎসক তাঁর বেশ কিছু সহকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে অক্লান্ত প্রচেষ্টায় বেশ কিছু মানুষকে বাঁচাতে পারলেন। ভেসে-আসা মৃতপ্রায়ের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে যেতে লাগল। এরপর নবীন চিকিৎসকের যেটা করল, তাতে সবাই সাধুবাদ দিল। নদীপাড়ে একটা হাসপাতাল গড়ে উঠল চিকিৎসকদের উদ্যোগে আর পরোপকারী কিছু ব্যবসায়ীর অর্থে। কিছু নদীতে ভেসে আসা মানুষ অবশ্য বেঁচে গেল, তার সঙ্গে নদীপাড়ে গড়ে উঠল বড় জনপদ, অনেক চিকিৎসকের কাজের সংস্থান হল আর হল ব্যবসায়ীদের অর্থ সমাগমের সুবন্দোবস্ত। এই সমাজকল্যাণ মূলক কর্মকাণ্ডে বাদ সাধল গুটিকয় খুঁতখুঁতে চিকিৎসক। এঁরা নদীর উজান বেয়ে অন্যভাবে হাওয়া খেতে গিয়ে দেখলেন, এক দৈত্য একা প্রকাণ্ড মুগুর নিয়ে মানুষ মেরে চলেছে। এই খুঁতখুঁতে চিকিৎসকের দল দৈত্যকে মেরে ফেললেন। হাসপাতালের ব্যবসায় মন্দা পড়ল, নবীন চিকিৎসকেরা ক্ষুণ্ণ হলেন, তবে সাধারণ মানুষ বললেন — একটা সুচিকিৎসা হল।

স্বাস্থ্যখাতে সরকারি আর বেসরকারি প্রচেষ্টায় যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়, তার মুখ্যভাগই খরচ হয়ে যায় গুটিকয় শহরের বড় হাসপাতালে। কোনো বেসরকারি হাসপাতালে কালেভদ্রে কোনো জটিল অস্ত্রোপচার হলে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় স্থান পায়। কিন্তু এতে সামগ্রিকভাবে সমাজের মোট রোগভোগের কোনো হেরফের হয় না। এই দৃষ্টিভঙ্গি কোনো মতেই আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের সামগ্রিক স্বাস্থ্যরক্ষায় সফলকাম হতে পারে না। আপৎকালীন চিকিৎসায় উদ্যোগ নিঃশেষ না করে, প্রতিরোধমূলক চিকিৎসায় জোর দেওয়াই আশু প্রয়োজন। ব্যক্তিগত ও সরকারি চিকিৎসাখাতে খরচের মুখ্যভাগই হৃদরোগ আর ডায়াবেটিস রোগে ব্যয় হয়ে যায় যদিও এই দুই রোগের প্রকোপ অনেক অল্প খরচেই নিবারণযোগ্য। যে দৃষ্টিভঙ্গিতে চিকিৎসা চলছে, তাতে মুষ্টিমেয় সচ্ছলের রোগ উপশম (Palliation), চিকিৎসকের আত্মশ্লাঘা পূরণ, আর সর্বোপরি সর্বোপরি বহুজাতিক ঔষধপ্রস্তুতকারী সংস্থার অর্থ সমাগমের সুবন্দোবস্ত হচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের আশু প্রয়োজন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই সহজবোধ্য অথচ সস্তা রোগ নিবারণে উদ্যোগের অভাব কেন?

আমার মতো অল্পবুদ্ধি নগণ্যকে এই সহজ প্রশ্নটা বেশ পীড়া

দিলেও এর উত্তরটা বেশ জটিল। কলেরা বা ডিপথেরিয়া রোগ প্রতিষেধকের মতো হৃদরোগ প্রতিরোদের কোনো টিকা নেই, যেটা কিনা অল্প আয়াসে প্রয়োগ করা যায়। হৃদরোগের নিবারণের জন্য চাই বৃহত্তর সমাজের জীবনযাত্রার আর অভ্যাসের পরিবর্তন। এই বিপুল কর্মকাণ্ডের সুফল চটজলদি মেলে না। আর এর জন্যই এই আন্দোলনটা একক ভাবে অথবা সামগ্রিকভাবে (সরকারি অথবা বেসরকারি) আকর্ষক নয়। কেবল এই বৈষম্যটাই পীড়াদায়ক, যখন দেখি, এইডসের মতো রোগ, যেটা কিনা সংখ্যাগরিষ্ঠ মধ্যবিত্তকে স্পর্শ করে না, তার প্রতিরোধের বার্তা মিডিয়ার দৌলতে গ্রামেগঞ্জে পৌঁছে গিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ চীনেও ধুমপান-বিরোধী সরকারি বিলবোর্ড দেখে এসেছি। আমাদের দুর্ভাগ্য, এর কল্পনাও দেশের কাণ্ডারীদের মাথায় নেই। হৃদরোগ প্রতিরোধের জন্য সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা জানা আছে, কেবল জানা নেই তার সফল প্রয়োগের আমলাতান্ত্রিক কূটনীতি।

একটা প্রাচীন প্রবচন নিবেদন করে নিবন্ধ শেষ করি। চিকিৎসক তিন প্রকারের হয়। উচ্চশিক্ষিত, পরিশ্রমী ও সফলকাম চিকিৎসক জটিল ও আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার প্রয়োগে মরণাপন্ন রোগীকে সুস্থ করে তোলেন। এঁদের চেয়েও ভালো চিকিৎসক রোগের প্রাথমিক লক্ষণ দেখা মাত্রই অল্প আয়াসে রোগমুক্তি ঘটাতে পারেন। সুচিকিৎসক তাঁর বিদ্যার প্রয়োগে, রোগ নিবারণ করে থাকেন। সুচিকিৎসকের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেলে, প্রথমোক্ত চিকিৎসকদেরও অবশ্য কর্মহীন হবার আশঙ্কা থেকে যায়। তাই বলে তো সুচিকিৎসকদের সংখ্যা বৃদ্ধি ও তাঁদের নিষ্কণ্টক কর্মকাণ্ডের আশা তো আমরা ছাড়তে পারি না!

উমা

এত ধর্মাচারী, তবু অনাচার কেন?

ষড়ানন পণ্ডা

দুটি প্রশ্ন বহুদিন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে, আজও সদুত্তর মেলে নি। এ বছর শারদোৎসবে উত্তরটা যদি মিলে যায়!

প্রশ্ন ১. ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র তা শুধু তকমায় না বাস্তবে?

২. ভারতের ছোট থেকে বড় নাগরিক —কেউ কি ধার্মিক?

নিরপেক্ষ মানে নির্ভরশীল নয়, সাপেক্ষ মানে নির্ভরশীল। (চলন্তিকা অভিধান —রাজশেখর বসু)। পটল, কুঁদরি, লাউ, কুমড়ো প্রভৃতি লতানে গাছ ভারা-সাপেক্ষ। ভারা না থাকলে এরা বাড়তে পারে না। আম, কাঁঠাল, নারকেল, তাল প্রভৃতি গাছ ভারা-নিরপেক্ষ, ভারা ছাড়া নিজেরাই বেড়ে ওঠে।

১৯৯২ সাল, ২ আগস্টের 'আজকাল' পত্রিকার উদ্ধৃতি—'রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে ডঃ শঙ্কর দয়াল শর্মা যে ব্যক্তিটির সর্বাধিক সমর্থন লাভ করেছেন তাঁর নাম জ্যোতি বসু। মার্কস্‌বাদী কমিউনিস্ট পার্টি সহ বামফ্রন্টের ভোট প্রায় নিরঙ্কুশ ভাবেই ডঃ শর্মার ওপর বর্তেছে। আর ৩০ জুলাই (১৯৯২) শপথ গ্রহণের মাত্র ৫ দিন পরেই তাঁর মুণ্ডিত মস্তকের ছবি প্রকাশিত হয় 'আজকাল'-এ। ... অগাধ পাণ্ডিত্য এবং বিনয়ী ডঃ শর্মা সর্বজন শ্রদ্ধেয় এক ব্যক্তিত্ব এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণের পরই তিনি উড়ে গেলেন তিরুপতিতে শ্রীবেঙ্কটেশ্বরের কাছে পূজো দিতে। পূজোই শুধু দিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাথাও মুড়োলেন। এরপর তাঁর গন্তব্য পূত্তাপূর্তি—সত্য সাঁই বাবার আশ্রম। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করার পর ভারতকে সেকুলার রাষ্ট্র ঘোষণা করে আমরা সেকুলার সমাজ গড়ার অঙ্গীকার করেছি। অথচ ধর্মনিরপেক্ষতার নাম নিয়ে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিরা কেউ মাচান বাবার, কেউ বজরং বাবার পদধূলি মাথায় নিয়ে নিজেকে এবং ভারতকে ধন্য করছেন! কেউ কেউ জ্যোতিষ বাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করছেন। এঁরাই মঞ্চে দাঁড়িয়ে জনগণকে ধর্মনিরপেক্ষতার বাণী শোনাচ্ছেন। ধর্মীয় বিশ্বাসবোধ, কুসংস্কার, আচার-আচরণ, ধর্মীয় অনুষ্ঠান, অনুশাসন, অলৌকিকতাকে আঁকড়ে ধরে আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছেন? আশা ছিল অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী শঙ্করদয়াল অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আরও প্রসারিত করবেন। কিন্তু কোথায় কী!

এই তো সেদিন, গত ২০ আগস্ট আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী ঈদলফিতরের নামাজের সমাবেশে দাঁড়িয়ে বললেন —'আমি যেমন নামাজে যোগদান করি, তেমনি হিন্দু-উৎসবেও যোগদান করি।' যোগদান করা অপরাধ নয়, কিন্তু কাজটা কি ধর্মসাপেক্ষ, অথবা ধর্মনিরপেক্ষ?

প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মগুলো টিকে আছে কেমন করে? হিন্দুরা নিজেকে, নিজের ধর্মকে অন্য ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে বিশ্বাস করে, শ্রেষ্ঠর বিপরীত শব্দ নিকৃষ্ট। অন্য ধর্মগুলো হিন্দু ধর্মের থেকে নিকৃষ্ট বলেই হিন্দুধর্ম টিকে আছে। আবার মুসলমানের কাছে, হিন্দু বা খ্রিস্টধর্ম নিকৃষ্ট। সেরকম খ্রিস্টানের কাছে, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মগুলো নিকৃষ্ট। সবধর্ম আমার কাছে শ্রেষ্ঠ এই প্রমাণ পাওয়া যাবে কি? বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ মহারাজকে কি নামাজে আমন্ত্রণ জানানো যাবে? আমন্ত্রণ গেলে তিনি কি আন্তরিকভাবে যোগ দেবেন? কলকাতার বড় মসজিদের

মোল্লা সাহেব কি দুর্গপূজোর মহাষ্টমীর মহাপূজা বা কুমারী পূজোয় যোগ দেবেন? সেরকম গির্জার ফাদার বৌদ্ধধর্মের লামা অন্য কোনো ধর্মের মূল অনুষ্ঠানে স্বেচ্ছায় যেতে আন্তরিক আছেন তো?

মুসলমানদের দুটি সম্প্রদায় — শিয়া এবং সুন্নী। মাত্র এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতি আছে কি? কেউ কাউকে সহ্য করতে পারে না।

খ্রিস্টানদের ওল্ড টেস্টামেন্ট আর নিউ টেস্টামেন্ট দুয়ের মধ্যে তীব্র গরমিল। ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট একে অন্যকে সুনজরে দেখে না।

হিন্দুদের তো ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আর্য, শাক্ত, বৈদিক পৌরাণিক —বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষায় কঠোর। সম্প্রতি আসামের বোরো এবং অ-বোরোদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। রামজন্মভূমি বাবরি মসজিদের দগদগে ক্ষত এতদিনে বিন্দুমাত্র সেরেছে কি?

রবীন্দ্রনাথ, মানবতার পূজারী, দরদী; তিনি বলেছিলেন —

'ধর্মকারার প্রাচীরে বজ্র হানো।
এ অভাগা দেশে জ্ঞানের আলোক জ্বালো।'

আমরা তাঁর কথায় কান দিই নি। আমরা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, বিবেকানন্দ, শরৎচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, রামপ্রসাদ, নজরুল কারুর কথাতেই কান দিই নি।

আর কয়েকদিন পরে তো বড় উৎসব দুর্গাপূজা, কালীপূজায় তারস্বরে মাইকে বাজবে —

'খড়ের প্রতিমা পূজিস রে তোরা —
মাকে তো তোরা পূজিস নে,
প্রতি-মার মাঝে প্রতিমা বিরাজে হায়রে অন্ধ দেখিস্ নে।'

আরও বাজবে—

'মায়ের মূর্তি গড়তে চাই মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে—
মা কি আমার মাটির মেয়ে, মিছে ঘাঁটি মাটি নিয়ে।
মা কি আমার খড় বিচালি ...
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো
যে ঘুচাবে মনের কালো —মাটিতে রং মাখাইয়ে?'

মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণের কণ্ঠে শুনবো—

'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।

যে দেবী মায়ের রূপ নিয়ে সকল মায়ের মধ্যে আছেন—আমরা তারই আরাধনা করছি।'

পূজামণ্ডপের আনাচে কানাচে মোদো মাতাল, নারীধর্ষণকারীদের হাত থেকে মায়েদের রক্ষার জন্য শত শত পুলিশ থাকবে। ভাসানের দিন কয়েক শত বর্বর যুবককে পুলিশ প্রেপ্তার করবে।

বাস, ট্রেকার, ট্যাক্সি, ট্রাকের সামনে কোনো না কোনো ঠাকুরের মূর্তি আছে, তাতে প্রত্যহ মালাচন্দন পড়ে। চালক মদ খেয়ে বেসামাল হয়ে বহুলোকের প্রাণ কেড়ে নেয়। সরকারি অফিসের যন্ত্রপাতি, কম্পিউটারের গায়েও বিশ্বকর্মা পূজোর দিন সিঁদুর দিয়ে আঁকা হয় বিভিন্ন রকমের চিহ্ন। এমন কোনো দোকান নেই যে যেখানে গণেশ বাবাজি অনুপস্থিত। যে দেশে সর্বত্র ধর্মের খরস্রোত বইছে, সেই দেশের খাঁটি জিনিসের পরিচয়ের জন্য আই এস আই লেখা হচ্ছে। ওষুধ কোম্পানির মালিকবাবু গণেশ পূজো করেই ভেজালে হাত পাকিয়েছেন—পুলিশ তাকে ধরতে পারছে না।

যে সব নেতা মন্ত্রী টেলিফোন, সার ও অন্যান্য কাজের কেলেঙ্কারির অক্টোপাশে বন্দী হয়ে পড়েছেন। ৮৫ বছর বয়সেও কয়েকদিন শ্রীঘরে থাকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন জীবনের শেষ অধ্যায়ে, স্বাস্থ্যভঙ্গের অজুহাতে ছাড় পেলেন —এঁরা তো সবাই কোনো না কোনো ধর্মের অনুগামী। ঘটা করে পূজো আর্চাও করেন।

যত দিন যাচ্ছে ততই দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, সন্তোষী মার পূজো, শনিঠাকুরের ঠেক হু হু করে বেড়েই চলেছে। ততই সমান তালে মদ, মাতাল, ভেজালদারী, চোরাকারবারী, নারীধর্ষণকারী, শিশুপাচারকারী, জালনোট প্রস্তুতকারীদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এরা তো সবাই দিনের প্রথমে খুব ভক্তি ভরে হাত জোড় করে ইষ্টদেবের কাছে প্রার্থনা করেন — কী প্রার্থনা করেন? আমার তো দৃঢ় ধারণা, এরা বলে প্রভু তোমায় তো কোনো দিন দেখি নি, তবে লোক ঠকিয়ে, ধরা না পড়ে যেন দুটো পয়সা দেখতে পাই—তুমি এইটুকু সুযোগ করে দাও।

শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীর ১০০০ মানুষের মধ্যে বোধহয় একজন নাস্তিক বা অধার্মিক লোক আছে কিনা সন্দেহ। তাহলে বাকি ৯৯৯ জন (তর্কের খাতিরে) ধর্মের অনুগামী। ধর্মাচরণগুলোর আচরণের বিশ্বজুড়ে এত সন্ত্রাস, যুদ্ধ, দাঙ্গা, অশান্তি কেন?

যে ধর্ম মানুষকে নিজের বাঁচার জন্য যে সকল সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্য উপভোগ করে, তা অপর সকলের জন্য স্বেচ্ছায় দিতে পারে, সেটাই প্রকৃত মানব ধর্ম। এই ধর্মের অনুগামীরাই প্রকৃত পক্ষে ধার্মিক। 'মানুষ মানুষের জন্য; সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'—পুঁথির পাতা থেকে নিজের জীবনের পাতায় আনতে পারবেন একমাত্র তাঁরাই প্রকৃত ধার্মিক। পূজোআচ্চা, নামাজ এখন আর মানুষকে ধার্মিক করতে পারে না। আসুন আমরা প্রকৃত ধার্মিক হওয়ার জন্য দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সখার প্রতি কবিতায় বলেছেন—

'যে নিজের চোখে দেখা ভাইকে বিশ্বাস করিল না, সে না দেখা ঈশ্বরকে বিশ্বাস করিবে কেমন করিয়া?'

উমা

প্রতিবেদন

জলবায়ুর পরিবর্তন : আমরা কেন আতঙ্কিত? আমাদের প্রস্তুতির পথ কি?

বিশ্ব-উষ্ণায়ন বর্তমানে বিশ্বব্যাপী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়। সামগ্রিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করতে প্রচুর সংস্থা গবেষণা চালাচ্ছে। সাধারণভাবে দেখা গেছে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইডের মতো কিছু বিশেষ গ্যাসীয় যৌগ স্বাভাবিক ঘনত্বের তুলনায় বেশি পরিমাণে উপস্থিত থাকলে বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা স্বাভাবিক মাত্রা থেকে বৃদ্ধি পায়। এই গ্যাসগুলি 'গ্রিন হাউস গ্যাস' নামে পরিচিত। এক শ্রেণীর গবেষকের মতে, মানুষের বিভিন্ন কাজকর্মের জন্য গ্রিন হাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এটি-ই হল পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। আবার অন্য এক শ্রেণীর মতে, মানুষের তৈরি করা গ্রিন হাউস গ্যাস উষ্ণায়ণ ঘটাতে সক্ষম হলেও বিশ্ব উষ্ণায়ণের জন্য যে পরিমাণ গ্যাসের দরকার তার তুলনায় এই ঘনত্ব অত্যন্ত কম, ফলে তা মোটেই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। তাহলে উষ্ণায়ণের কারণ কী? বিশ্ব উষ্ণায়ণ কি সত্যিই হচ্ছে? এর নেপথ্যে কি মানুষের যথার্থই কোনো ভূমিকা আছে? উষ্ণায়ণ রোধেই বা কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত? এমন নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই দিল্লির লিবার্টি ইনস্টিটিউট ২১শে এপ্রিল, ২০১২ কলকাতায় এক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল যার মূল আলোচ্য ছিল : 'জলবায়ুর পরিবর্তন : আমরা কেন আতঙ্কিত? আমাদের প্রস্তুতির পথ কী?'

আলোচনা সভাটি তিনটি অধিবেশনে বিভক্ত ছিল :

প্রথম ভাগ : জলবায়ুর পরিবর্তন : কীভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করা উচিত; দ্বিতীয় ভাগ : উষ্ণায়ণের ভয়াবহতা হ্রাস করার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি; তৃতীয় ভাগ : বক্তা এবং দর্শকদের মধ্যে পারস্পরিক আলোচনা এবং মত বিনিময়।

বিশ্ব উষ্ণায়ণের প্রেক্ষাপটে এই ধরনের আলোচনা সভা সমস্ত নাগরিকদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব উষ্ণায়ণ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়েছে এমন কি বিভিন্ন ক্ষেত্রে (যেমন, কৃষি, স্বাস্থ্য বা সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে) বিশ্ব উষ্ণায়ণের তাৎক্ষণিক বা সুদুরপ্রসারী প্রভাব কী হতে পারে এবং এই সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণার কথাও আলোচনায় বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে।

প্রথম অধিবেশনের প্রথম বক্তা ছিলেন ডঃ মোহিত রায়। তাঁর মতে, বিশ্ব উষ্ণায়ণ একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু সেটি তরান্বিত করছে মূলত 'কার্বনডাই অক্সাইড' নামের গ্যাসীয় যৌগটি। কাজেই প্রথমে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত এর নির্গমণের পরিমাণ। আর সেই পরিমাণকে একটি বিশেষ মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে মূলত দুটি কৌশলের কথা বলেছেন মোহিতবাবু। প্রথমটি হল 'মিটিগেশন' অর্থাৎ বিশেষ কিছু প্রযুক্তি ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাই অক্সাইড নির্গমণের মাত্রা হ্রাস করা এবং দ্বিতীয়টি হল 'অ্যাডাপটেশন' অর্থাৎ উন্নততর প্রযুক্তি গ্রহণ করা। কার্বন ফুট প্রিন্ট (সিএফপি)-এর নিরিখে বিচার করলে, জনসংখ্যা পিছু 'গ্রিন হাউস গ্যাস' নির্গমণের পরিমাণ পশ্চিমী দেশগুলির ক্ষেত্রে প্রাচ্য দেশগুলির তুলনায় অনেকগুণ বেশি। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সমীক্ষায় তা প্রমাণিতও হয়েছে। সুতরাং গ্রিন হাউস গ্যাস নির্গমণে রাশ টানতে পশ্চিমী দেশগুলিরই অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত।

পরবর্তী বক্তা অধ্যাপক সুজয় বসু বিশ্ব উষ্ণায়ণ রোধে রাষ্ট্রপুঞ্জের 'ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ' (আই পি সিসি)-এর ভূমিকার সমালোচনা করেন। তাঁর মতে আইপিসিসি-র জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত পূর্বাভাস সম্পূর্ণরূপে সঠিক নয়। তিনি আই পি সিসি এবং এন আই পি সি সি-র (ননগভর্নমেন্টাল ইন্টারন্যাশনাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ) রিপোর্ট দুটির মধ্যে তুলনা করে দেখান যে এই দুটি রিপোর্টের মতামত সম্পূর্ণরূপে পরস্পর বিরোধী। আই পি সিসি তাদের তৃতীয় মূল্যায়ন রিপোর্টে বলেছে, ২১০০ সালের মধ্যে বিশ্বের উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবে ১.৪° সেন্টিগ্রেড থেকে ৫.৮° সেন্টিগ্রেড। এই ধরনের তথ্য নিঃসন্দেহে বিশ্ববাসীর মনে চিন্তার উদ্রেক ঘটাবে। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি একটু অন্যরকম। সুজয়বাবুর মতে, বিশ্বের তাপমাত্রা অবশ্যই বাড়ছে, তার মূল কারণ 'লিট্‌ল আইস এজ'-এর পর থেকে স্বাভাবিকভাবেই বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি

পাওয়ার কথা। এর সঙ্গে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ণের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্ব উষ্ণায়ণে মানুষের ভূমিকা খুবই সামান্য। শিল্পায়নের পরবর্তী পর্যায়গুলিতে জৈব জ্বালানীর ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। কিছু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ২০২৫ সালে তেল উৎপাদনের পরিমাণ সর্বোচ্চ হবে এবং ২০৫০ সালের কাছাকাছি সময়ে বিশ্বে তেল আর মিলবে না।

পরবর্তী বক্তা বরুণ মিত্রের মতে ঝড়ঝঞ্ঝার ভয়াবহতা বৃদ্ধি পেলেও এটি ভাবার কোনো কারণ নেই যে এর সঙ্গে বিশ্বে উষ্ণায়ণের সরাসরি সম্পর্ক আছে। ভারতের মতো দেশগুলির ক্ষেত্রে এই ধরনের বিপর্যয়েরও মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি আপৎকালীন ব্যবস্থা অত্যন্ত শিথিল। সাধারণ ভাবে দেখা গেছে, বিশ্ব উষ্ণায়ণের সঙ্গে সঙ্গে খরার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যেহেতু খরার সঙ্গে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের সম্পর্ক এখনও স্পষ্ট নয়, সুতরাং মূল বিষয়টি হচ্ছে ভারতে খরা হলে খরার ভয়াবহতা কীভাবে মোকাবিলা করা হবে। তিনি আরও বলেন যে, ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে শস্য উৎপাদনও বৃদ্ধি পাচ্ছে। শীতকালীন রবি শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খরার প্রকোপও কমেছে এবং অনাহারও হ্রাস পেয়েছে। এই অনাহারের সঙ্গে কিন্তু বিশ্ব উষ্ণায়ণ বা জলবায়ু পরিবর্তনের কোনো সম্পর্ক নেই বলেই মনে হয়। কারণ বিভিন্ন পরিসংখ্যানের দ্বারা এই তথ্যকে প্রমাণ করা যায়।

দ্বিতীয় অধিবেশনের মূল আলোচ্য ছিল, জলবায়ু সংক্রান্ত দ্বন্দ্বের সমুখসমরে দাঁড়ানোর প্রস্তুতির পর্যালোচনা করা। এই অর্ধে প্রধান বক্তারা ছিলেন, ডঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়, ডঃ অঞ্জন সেনশর্মা, অধ্যাপক গৌতমকুমার সেন এবং ডঃ মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়। বক্তারা যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্লেষণে জলবায়ুর পরিবর্তন জনিত পৃথিবীর বাস্তব অবস্থাকে তুলে ধরেছেন।

পরিবেশ দূষণের ফলে যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে, তার প্রভাবে আর্থ-সামাজিক অবনতির সঙ্গে জন্ম নেয় বিভিন্ন স্বাস্থ্য সমস্যা। ডঃ সঞ্জীব মুখোপাধ্যায় প্রধানত মানুষের স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব সমূহের উপর আলোকপাত করেছেন। জলবায়ু পরিবর্তন, বিশ্ব উষ্ণায়ণের ফলে বিভিন্ন অঙ্গের বিশেষত শ্বাসনালীর প্রদাহ, রক্তাল্পতা, ক্ষয়রোগ, বাহক বাহিত রোগের ক্রমান্বয় বৃদ্ধি লক্ষণীয়। স্ত্রীরোগের উপরও যে এর আংশিক প্রভাব রয়েছে তা আজ স্বীকৃত। মহিলাদের উপর বিভিন্ন বিষম ব্যাধি, যেমন স্তনের ক্যানসার, ডিম্বাশয়ের অসুখ, সন্তানহীনতা, ক্রমবর্ধমান প্রকোপ লক্ষণীয়। এই সমস্ত ব্যাধির মূল কারণ বাতাসে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক (পি এ এইচ) বস্তুর উপস্থিতি যার প্রধান উৎস হল পেট্রো রসায়ন শিল্প।

ডঃ অঞ্জন সেনশর্মা প্রথম পর্যায়ে আবহাওয়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে এক মৌলিক ধারণা গড়ে তুলেছেন। সহজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য। আবহাওয়া সাধারণত স্থানীয় এবং জলবায়ু সর্বব্যাপী ঘটনার সার্বিক বিবরণ নথিভুক্ত করে রাখে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর সীমা নির্ধারণের জন্য উপযুক্ত গাণিতিক নিদর্শনও আমরা পেয়েছি। আবহ বিজ্ঞানীরা জলবায়ুর পরিবর্তন চিহ্নিত করার জন্য বাতাস ও জলের যে সমস্ত ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তন পরিমাপ করেন তার মধ্যে তাপমাত্রা অন্যতম। অঞ্জনবাবু আবহাওয়া ও জলবায়ুর পূর্বাভাস পদ্ধতির যে সংক্ষিপ্ত, স্বচ্ছ বর্ণনা এবং সমালোচনা করেছেন তা প্রশংসনীয়। জলবায়ু ও আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ব্যবহৃত প্রতিমানগুলির প্রাথমিক গাণিতিক গঠন প্রায় সমান, কিন্তু বিভিন্ন ভৌতপ্রক্রিয়ার ভিন্ন ব্যাপ্তি ও স্তরের অনিশ্চয়তার জন্য বাস্তব পর্যবেক্ষণের সঙ্গে পূর্বাভাসের বিচ্যুতি লক্ষণীয়। তাঁর বিচক্ষণ আলোচনার মাধ্যমে শ্রোতাগণ জলবায়ু সংক্রান্ত পূর্বাভাসের মূল সমস্যার সম্বন্ধে নিঃসংশয় সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

হুগলী নদী পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী অঞ্চলকে দুই ভিন্ন প্রকৃতির অঞ্চলে বিভক্ত করেছে। একদিকে বালুকাময় বেলাভূমি ও অন্যদিকে কর্দমাক্ত নদীর মোহনা —ম্যানগ্রোভ বনভূমি —সুন্দরবন।

হুগলী নদীর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত প্রশস্ত বেলাভূমি প্রধানত ভ্রমণোপযোগী অঞ্চল নামেই খ্যাত। এই অঞ্চলের দীঘা, শঙ্করপুর, মন্দারমণি, দাদনপাত্রবার ইত্যাদি জায়গায় বিগত ১০-১২ বছর ধরে কাজ করে চলেছেন প্রফেসর গৌতমকুমার সেন। তিনি এই অঞ্চলের পরিবর্তনশীল আবহাওয়া ও উপকূলবাসীর সঙ্গে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয়টি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করেছেন। তিনি প্রধানত পরিবেশ সম্বন্ধীয় সামাজিক সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন; যা প্রধানত দরিদ্র মানুষেরই সমস্যা। উপকূলবর্তী ক্ষয়, চরম দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক সমস্যার ক্রমান্বয় বৃদ্ধির জন্য মূলত মনুষ্যসমাজই দায়ী। জলবায়ু পরিবর্তন হয়তো একে খানিকটা প্রভাবিত করে। ডঃ সেন বৈজ্ঞানিক, গবেষক ও সরকারি আধিকারকিদের উপর প্রধানত দু'ধরনের দায়িত্ব অর্পণ করতে চেয়েছেন। প্রথমত সচেতনতা শিবির আয়োজনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার সুনিশ্চিত করার শিক্ষাদান করা এবং দ্বিতীয়ত উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ভুল তথ্য সংগ্রহ করে, তার যথাযথ ব্যবহার করা।

ডঃ মীনাক্ষী চ্যাটার্জী, পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনভূমি সুন্দরবনের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন। সুন্দরবন একদিকে যেমন এক প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক যা আমাদের ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে, অন্যদিকে গঙ্গার দূষিত জলরাশিকে পরিশোধিত করে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা নদীর এই বিপুল স্বাদুর পরিশোধিত জলরাশির অন্যতম ভূমিকা

হল ভারতের বর্ষা নিয়ন্ত্রণ করা। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র ও বিপুল জীববৈচিত্র্য জলের বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের উপর নির্ভরশীল যেমন লবণাক্ততা, জোয়ারভাঁটা ইত্যাদি। কিন্তু অধিকাংশ সময়ে এই সমস্ত উপাদানের বিজ্ঞানসম্মত তথ্য সীমিত কখনও বা তা অপ্রাপ্য /দুষ্প্রাপ্য। মীনাক্ষীদেবীর মতে, বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে, তাকে যথাযথভাবে সাংগঠনিক পদ্ধতিতে রক্ষা করা উচিত। এই ধরনের তথ্য দ্বারা বিভিন্ন গাণিতিক প্রতিমাণের উপর ভিত্তি করে নির্ভরযোগ্য ভবিষ্যৎ দৃশ্যকল্প তৈরি করা সম্ভব।

এই আলোচনা সভা থেকে এটি অন্তত স্পষ্ট হল যে শুধুমাত্র শিল্পায়ন বা আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারই বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের ওপর সৌরমণ্ডলের প্রভাব যথেষ্ট এবং তা নিয়ে গবেষণাও চলছে। তবে জলবায়ুর পরিবর্তন এবং তার প্রভাব সম্যক ভাবে বোঝার জন্য প্রয়োজন সারা বিশ্বব্যাপী নিরপেক্ষ গবেষণার।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনায় ছিলেন আশীষ লাহিড়ী, তাঁর সুচারু পরিচালনায় অনুষ্ঠানটি আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

প্রতিবেদক : শরণ্যা চক্রবর্তী ও মধুমিতা দাস

উ মা

বালি-ঘোষপাড়ায় জলাভূমিতে প্রমোটারের থাবা

১০ কাঠার বেশ বড়সড় জলাভূমিটি বোধহয় আর থাকবে না। তার কারণ একটাই, জলাভূমিটির মালিক স্নেহলতা পালের সাথে এক প্রমোটরের কথাবার্তা পাকা হয়ে গেছে। আপাতত জলের মধ্যে বাঁশের বেড়া দিয়ে আংশিক ভরাট করে বাড়ি তোলা হবে। এরপর পুরো জলাভূমিটি হারিয়ে যাবে। জায়গাটা হল হাওড়া জেলার বালি স্টেশন থেকে দশ মিনিটের হাঁটা দূরত্বে বালি গ্রামপঞ্চায়েতের অধীন উত্তর ঘোষপাড়া। স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের এ ব্যাপারে কোনও হেলদোল নেই। অথচ জলাভূমি রক্ষার আইনে পরিষ্কার বলা আছে, এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের ভূমিকাই চূড়ান্ত। ফোরাম ফর সিটিজেন অ্যান্ড প্রোটেকশন রাইটস-এর কর্মীরা জলাভূমিটি বাঁচাবার জন্য ছুটোছুটি করছেন, বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি পাঠাচ্ছেন, বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির সাথে যোগাযোগ করছেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সাড়া পাওয়া যায় নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা তপন দত্ত ২০০০ বিঘার জলাভূমি বাঁচাতে গিয়ে কর্পোরেট হাউসের ভাড়াটে গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত এই জলাভূমিটি বাঁচানো যাবে কিনা ভবিষ্যতই বলতে পারে।

উ মা

সংগঠন সংবাদ

শ্মশানে মরণোত্তর চক্ষু সংগ্রহ

২৭তম জাতীয় চক্ষুদান পক্ষ (১৫ আগস্ট থেকে ৮ সেপ্টেম্বর) চলাকালীন কলকাতার কেওড়াতলা ও হাওড়ার শিবপুর শ্মশানঘাটে যথাক্রমে ১৫-১৬ আগস্ট ও ১-২ সেপ্টেম্বর মরণোত্তর চক্ষুদানের এক প্রচার কর্মসূচি পালন করা হয়। হাওড়া স্বদেশ আই ফাউন্ডেশন, পূর্ব রেলওয়ের লিলুয়া ওয়ার্কশপের অ্যাকাউন্টস্ রিক্রিয়েশন ক্লাব এবং শ্রীরামপুর সেবাকেন্দ্র ও চক্ষুব্যাঙ্ক আয়োজিত এই দুই প্রচার কর্মসূচিতে পাঁচ জোড়া মরণোত্তর চক্ষু সংগৃহীত হয়। হিন্দু সৎকার অনুযায়ী দাহ করতে আনা পাঁচটি মরদেহের ক্ষেত্রে চক্ষু সংগ্রহের নির্দিষ্ট সময়সীমা পার হয়ে যায় নি। মৃতের পরিবারের সম্মতিতেই পাঁচটি মরদেহ থেকে ১০টি কর্ণিয়াই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথালমোলজিতে জমা দেওয়া হয় কর্নিয়াজনিত কারণে ১০জন দৃষ্টিহীন মানুষের দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে।

মরণোত্তর চক্ষুদান আন্দোলনকে এক পারিবারিক আন্দোলনে রূপ দিতে এই ধরনের উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

প্রথম রক্তদান শিবিরের সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন

ভারতবর্ষে প্রথম স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ সালের ৪ আগস্ট থেকে ১৬ আগস্ট। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত এই শিবিরে ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষার্থী মিলিয়ে ৩০১ জন রক্তদান করেন। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেনের প্রেরণায় এই রক্তদান শিবির আয়োজিত হয়। প্রথম এই রক্তদান শিবিরের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে গত ১৮ আগস্ট ২০১২ সন্ধ্যায় যাদবপুরের বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ইন্দুমতি সভাগৃহে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ও অ্যাসোসিয়েশন অব ভলান্টারি ব্লাড ডোনার্স, পশ্চিমবঙ্গ যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সেই শিবিরে রক্তদান করেছিলেন এমন অনেক মানুষই এই দিনের অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে সেই রক্তদান শিবিরের স্মৃতি রোমন্থন করেন।

ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স ও প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পৃথক অনুষ্ঠানে গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ যথাক্রমে সি ভি রমন-এর 'রমন এফেক্ট' আবিষ্কারের স্মরণে এবং জগদীশচন্দ্র বসুর ফাস্ট মিলিমিটার ওয়েভ কমিউনিকেশন আবিষ্কারের স্মরণে দুটি ফলক বসানো হয়। নিউইয়র্কের ইনস্টিটিউট অব ইলেট্রনিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার্সের (আই ই ই ই) পক্ষে সভাপতি পিটার স্টেকার এই দিনের পৃথক দুটি অনুষ্ঠানে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অব সায়েন্স-এর মহেন্দ্রলাল সরকার প্রেক্ষাগৃহে প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা কঙ্কন ভট্টাচার্যের হাতে সি ভি রমনের নামাঙ্কিত ফলক এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরোজিও প্রেক্ষাগৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মালবিকা সরকারের হাতে জগদীচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত ফলক তুলে দেন। দুটি অনুষ্ঠানেই আই ই ই ই-র কলকাতা শাখার সভাপতি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার অধ্যাপক ডঃ শিবাজী চক্রবর্তী উপস্থিত থেকে জানান যে, ১৬০টি দেশে ছড়িয়ে থাকা ৪০ হাজার সদস্য বিশিষ্ট সংগঠন আই ই ই ই মহান ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সম্মান জানাতে পেরে কৃতজ্ঞ। উল্লেখ্য এই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ভারতে এই ফলক বসানোর কাজ প্রথম করলেন।

প্রতিবেদক সীতাংশুকুমার ভাদুড়ী

উমা

পরের সংখ্যা জানুয়ারি ২০১৩-য় বেরোবে।

আগামী বইমেলায় উৎস মানুষ-এর স্টল থাকছে।

অঙ্কে কাঁচা বা পাকা

পুলক লাহিড়ী

মহামানবদের নিয়ে আমরা কল্প-কাহিনী তৈরি করতে ভালবাসি। গাছের আপেল কেনই বা নিচে পড়ে —এই প্রশ্নই নাকি নিউটনকে তাঁর গতিসূত্রের প্রবর্তনার ইন্ধন জুগিয়েছিল। পতনশীল আপেলটি ধরেই নিচ্ছি, কাঁচা নয়; কেন না, পাকা ফলই মাটিতে ঝরে পড়ে স্বাভাবিক নিয়মে। তবে, কাঁচা অবস্থা থেকে পাকতে সময় লাগে এবং তার জন্য অনুকূল আবহের দরকার। প্রকৃতিতে যা ঘটে —মানুষের ক্ষেত্রেও তাই। পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে সময় এবং অনুকূল পরিবেশ উভয়েরই দরকার। কথাগুলো মনে এল আমাদের একটি ভ্রান্তি বিষয়ে আলোচনা শুরু করতে গিয়ে। এই যে আমরা প্রায়ই বলে থাকি অমুকে অঙ্কে কাঁচা বা তমুকে অঙ্কে পাকা, কেউ কেউ ইতিহাসে কাঁচা কিন্তু ভূগোলে পাকা —কচিকাঁচাদের নিয়ে এই যে আক্ষেপ, তা কতটা বিজ্ঞানসম্মত? অঙ্কে কাঁচা হব না পাকা হব —এই ভবিষ্যতলিপি ললাটে ধারণ করেই কি মানুষ জন্মায়? খেয়াল রাখতে হবে যে কোনও বিষয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠার ছাপ পড়ে আমাদের আচরণ ও ব্যক্তিত্বে, এবং তা অর্জন করতে হয়। এই অর্জনের বেশিরভাগটাই আসে শিক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে। তার জন্য উপযুক্ত সময়ের দরকার। শৈশবে আমাদের বেশ কিছু আচরণ প্রবৃত্তি (instinct) তাড়িত। জন্মেই একটি বাছুর তার মা-র স্তন থেকে দুধ পান শুরু করে। কেউ তো তাকে শেখায় নি যে, যা পান করতে হবে তা দুধ এবং তার উৎস স্তনের বাঁট! অনেকটাই অসহায় অবস্থায় জন্ম বলেই যাতে একেবারে জলে না পড়তে হয়, তার জন্য যে কোনও প্রাণীই কিছু ব্যবহারিক আচরণ-প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মায় —এই সহজাত প্রবৃত্তি খুবই সীমিত; প্রাণীদের ক্রমশ পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষণের মাধ্যমেই নিজেদের অভিজ্ঞ করে তুলতে হয়। সহজাত বা অর্জিত —যে ধরনের আচরণ-ই হোক না কেন তার কেন্দ্র হল মস্তিষ্ক; কোনও ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশেষ দৃশ্য, গন্ধ বা শব্দের প্রেরণায় মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট স্নায়ু-মণ্ডল উজ্জীবিত হয় যার প্রভাবে প্রাণী কোনও সহজাত আচরণ করে। তে-কাঁটা স্টিকেল্ব্যাক্ (Three spined sticleback) মাছেদের কথাই ধরুন। প্রজনন ঋতুতে কোনও স্ফিতোদর স্ত্রী মাছকে দেখলেই পুরুষ মাছেরা উদ্দীপ্ত হয় এবং নির্দিষ্ট আঁকা-বাঁকা (Zig-Zag) ঢঙে 'নাচ' করে তার সঙ্গ কামনা করে। স্ফিত উদর ডিম্ববতী হবার দ্যোতক —সুতরাং এ হল পুরুষ মাছের জন্য এক দৃশ্য-ইঙ্গিত (sign stimulus), যার পরাকাষ্ঠায় মাছেদের ঐ যৌন-আচরণ। এই 'নাচ' বা আচরণ তাকে কেউ শেখায় নি —এ তার সহজাত। বর্ষাকালে ব্যাঙের ডাক অনেকটাই সহজাত কিন্তু বসন্তের কোকিলের'গান' তাকে শিখতে হয়; গান আত্মস্থ করবার জন্য অবশ্য মস্তিষ্কে তার নির্দিষ্ট 'ছাঁচ' (template) থাকে, যা তার গানের নির্দিষ্ট সুর তুলতে সাহায্য করে।

$$D = \frac{\sum_{t=1}^{N} \frac{t \cdot C_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^{N} \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

নামী গায়ক বা যন্ত্রবিদদের সাগরেদদের দীর্ঘ সময় সরগম অভ্যেস করতে হয়, তবেই না তারা একদিন ওস্তাদের সার্থক উত্তরসূরি হয়ে উঠতে পারে। কোকিলেরও তাই —তাকে 'গান'

তুলতে হয়, সুর অভ্যেস করতে হয়। প্রাণী যত উন্নত হয়েছে, অর্থাৎ তার মস্তিষ্কের স্নায়ুমণ্ডলের জটিলতা ও কর্মক্ষমতা বেড়েছে, তত সহজাত আচরণের পরিবর্তে শিক্ষালব্ধ আচরণ সে বেশি আয়ত্ব করেছে —তার চূড়ান্ত উদাহরণ হল মানুষ। মানুষের আচরণ প্রায় সবটাই অভিজ্ঞতালব্ধ —শিক্ষা তার এক অন্যতম উপায়।

পাটিগণেতের যে সাধারণ বা মৌলিক যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ —যা নির্ভর করে সংখ্যার পরিচিতি, বিন্যাস ও অবস্থাভেদের উপর —এ বুঝতে হলে যে সাধারণ বুদ্ধির দরকার, তার আধার হল মস্তিষ্কে প্যারাইটাল (Parietal) নামের নির্দিষ্ট স্নায়ু কোষমণ্ডল ও তাদের সন্নিধির (synapse)-এর উপর। এর Intra parietal

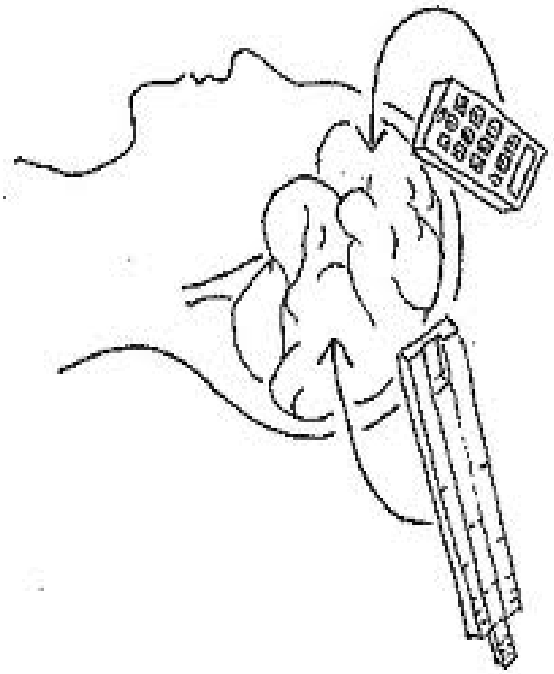

sulcus (IPS) অংশটি বিশেষ করে, সংখ্যা সনাক্ত করা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। মস্তিষ্কের প্যারাইটাল অঞ্চলটি আবার বাগ্‌ধারার সঙ্গেও যুক্ত। প্যারাইটাল অঞ্চলে ক্ষতি হলে অঙ্ক করবার পটুত্বও বিঘ্নিত হয়। অংকের অধ্যাপকদের প্যারাইটাল অঞ্চলের আয়তন তাদের বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে বাড়ে; এ কথা লন্ডনের ট্যাক্সি চালকদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য —যেহেতু তাদের লন্ডনের অলি-গলি ভাল করে চিনে রাখতে হয়। এখন অবশ্য জি পি এসের দৌলতে তাদের অনেকটাই সুবিধা হয়ে গিয়েছে। এর সঙ্গে অঙ্ক কষার সম্পর্ক কি? সম্পর্ক হল —চিনতে পারা, মনে রাখতে পারা এবং গাণিতিক সংখ্যা চেনার ভিত্তি মস্তিষ্কের একই জায়গায় —ঐ প্যারাইটাল অঞ্চলে। সংখ্যা চেনার পর তাদের নানাভাবে প্রয়োগ করার মাঝেই অঙ্কে পটুত্ব (skill) অর্জন করা সম্ভব, তার জন্য বারবার অঙ্ক করতে হয়, শিখতে হয় যাতে সেই শিক্ষা নববলে বলীয়ান (reinforcement) হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় অঙ্ক অনেকটাই বিমূর্ত। একটি প্রাণীর দেহ ব্যবচ্ছেদ করে বা কোনও দ্রবণের অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে অঙ্ক প্রমাণ করা যায় না বা তাকে দৃশ্যমান করা যায় না। সুতরাং প্রাথমিকভাবে অঙ্ক বিষয়ে ধারণা তৈরি করাই একটা বড়সড় বাধা, যে বাধা অতিক্রম করতে অঙ্কের শিক্ষক মশাইদের দায়িত্ব সবথেকে বেশি। অংক বিষয়ে আগ্রহ তৈরি করা এবং তা টিকিয়ে রাখা —এ সম্ভব হলে বাদবাকি কাজটা অনেকটাই সহজ। বস্তুত অঙ্কে কাঁচা বা পাকা এ কথাগুলো শিক্ষকের অক্ষমতার দোহাই। তথাকথিত অংকে কাঁচাদের দুটি ভাগ : (ক) অঙ্কে তারা পটুত্ব অর্জন করে নি বা (খ) কোনও অনুশীলনের সমাধান করতে সে তার পটুত্ব কিভাবে প্রয়োগ করবে, তা সে ঠিক বোঝে না। দুটিই মূলত অনভ্যাস এবং অনাগ্রহের ফল। এবং তা শিক্ষকের দায়িত্বের অভাবের দ্যোতক। স্ট্রিং মতবাদের প্রবক্তাদের একজন বিজ্ঞানী অলোক সেন সম্প্রতি 'ইউরিমিলনার' পুরস্কার পেলেন —যার অর্থমূল্য প্রায় সাড়ে ষোলো কোটি টাকা! তিনি ক্লাসে ফার্স্ট বয় ছিলেন না, অঙ্কে ভুল করায় বাবার কাছে ধমকও খেতেন ছোটবেলায় (আ. বা. পত্রিকা, ১লা আগস্ট, ২০১২ পথিক গুহর প্রতিবেদন)। তিনিই আজ পৃথিবীর প্রথম সারির পদার্থ বিজ্ঞানীদের পাশে দাঁড়িয়ে। পুরোপুরি গণিতের ওপর নির্ভর স্ট্রিং থিয়োরির অন্যতম প্রবক্তা আলোক সেন কি তাহলে অঙ্কে কাঁচা? কথাটি আইনস্টাইন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য; ছোটবেলায় অঙ্কে তিনি দারুণ 'পাকা' ছিলেন, তার কোনো নজির নেই।

উমা

উৎস মানুষ পত্রিকার গ্রাহক হতে হলে

গ্রাহক চাঁদা বছরে ১০০ টাকা। বছরের যে কোনও সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

United Bank of India, College Street Branch, Kolkata - 7000073. Utsa Manush, SB Account No. 0083010748838।

এই অ্যাকাউন্ট নম্বরে **UBI**-এর যে কোনো শাখায় টাকা জমা দিন অথবা আমাদের ঠিকানায় চেক পাঠান। ফোন করে কিংবা ই-মেল করে আপনার ঠিকানা এবং কোন মাস থেকে গ্রাহক হলেন জানিয়ে দিন। ডাকে পত্রিকা পাঠানো হবে।

পুস্তক পর্যালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ও কুসংস্কার — ভবানীপ্রসাদ সাহু। দাম - ১০০.০০ টাকা। জ্ঞান বিচিত্রা প্রকাশনী, আগরতলা।

প্রদীপ্ত গুপ্তরায়

ভবানীপ্রসাদ সাহুর লেখা 'রবীন্দ্রনাথ ও কুসংস্কার' সামগ্রিকভাবে উপভোগ্য। তবে কিছু পরিবর্তন / পরিমার্জন করলে হয়তো আরো একটু আকর্ষণীয় হতে পারে।

১) 'সূত্র নির্দেশ' বই-এর শেষে থাকলে ভাল হতো। এতে পঠনের সাবলীলতা থাকে।

২) রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে অনেকেই লেখকের সঙ্গে একমত হতে পারবেন না। 'আমি নিজেকে ব্রাহ্ম বলে গণ্যই করি না', এ কথাটা যতখানি সত্য (গণ্য না করার কারণ হয়তো ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্দ্বন্দ্ব, যা রবীন্দ্রনাথকে বারবার বিব্রত করেছিল), তিনি নিজেকে হিন্দু বলে মনে করতেন, এটা ততোধিক সত্য। 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে [রবীন্দ্র রচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ) ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ১৬৫] তিনি লেখেন, 'আমি হিন্দু, এ কথা বলিলে যদি নিতান্তই কোনো লজ্জার কারণ থাকে তবে সে লজ্জা আমাকে নিঃশব্দে হজম করিতেই হইবে। হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের যদি বিরোধ থাকে, তবে আমি হিন্দু নই বলিয়া সে বিরোধ মিটাইবার ইচ্ছা করাটা অত্যন্ত সহজ পরামর্শ বলিয়া শোনায় কিন্তু তাহা সত্য পরামর্শ নহে। ... আমি হিন্দু নই বলিলে হিন্দু মুসলমানের বিরোধটা যেমন তেমনই থাকিয়া যায়, কেবল আমিই একলা তাহা হইতে পাশ কাটাইয়া আসি।' এছাড়াও, রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায়, 'এ কথা নিশ্চিত সত্য যে, স্বাস্থ্য যেমন সমস্ত শরীরকে জুড়িয়া আছে ধর্ম তেমনি মানুষের সমগ্রপ্রকৃতিগত।' [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শিক্ষা', রবীন্দ্ররচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পৃ. ৬১৩।]

৩) 'ধর্ম ও ধর্মবিশ্বাস' বিভাগে (পৃ. ২৩) লেখক বিভিন্ন দেশের 'নাস্কি'-এর এক হিসাব দিয়েছেন। তথ্যসূত্র দিলে ব্যাপারটার যুক্তিবোধ্যতা হয়তো আরো বাড়ে।

৪) সাম্প্রদায়িকতার পেছনে যে তথাকথিত রাজনৈতিক হাত প্রবল ছিল এবং এখনো আছে, সেটা রবীন্দ্রনাথের অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা 'কনগ্রেস' নামের এক লেখাতে বলেন [ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৩৮১], '... দুই পক্ষের দুই অসমান বাটখারায় অন্নবিভাগের শোচনীয় পরিনাম হচ্ছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে নানা দৃষ্টান্তে কথায় কথায় তীব্র করে তোলা। তাকে শান্ত করার অবকাশ থাকবে না। ... শাসনকর্তাদের হাতবদল হবেই, কিন্তু হিন্দু-মুসলমান চিরকাল পাশাপাশি থাকবেই, তারা ভারতভাগ্যের শরীক —অবিবেচক দণ্ডধারী তাদের সম্বন্ধের মধ্যে যদি গভীরভাবে কাঁটা বিধিয়ে দেয় তবে তার রক্তস্রাবী ক্ষত শীঘ্র নিরাময় হবে না।' কথাটা যে কত সত্যি সেটা আমরা বর্তমানের প্রতিদিনের ঘটনাপ্রবাহে গভীরভাবে বুঝতে পারছি।

৫) 'চরকা' প্রসঙ্গে লেখক যদি আরো কিছু যোগ করতেন রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি আরো বেশি আলো ফেলা যেত বলে মনে হয়। যেমন, 'য়ুরোপীয় সভ্যতার বিজ্ঞানচর্চার সামনে যদি কোন বড় নৈতিক সাধনা থাকে সে হচ্ছে বাহ্যপ্রকৃতির হাতের সবরকম মার থেকে মানুষকে বাঁচানো, আর হচ্ছে মানুষেরই মনটাকে যন্ত্রে না বেঁধে প্রাকৃতিক শক্তিকেই যন্ত্রে বেঁধে সমাজের কাজ আদায় করা। এ কথা নিশ্চিত যে, বিজ্ঞানকে একপাশে ঠেলে রেখে কেবল হাত চালিয়ে দেশের বিপুল দারিদ্র্য কিছুতে দূর হতে পারে না। মানুষের জানা এগিয়ে চলবে না, কেবল তার করাই চলতে থাকবে, মানুষের পক্ষে এতো বড়ো কুলিগিরির সাধনা আর কিছুই নেই।' ['চরকা', রবীন্দ্ররচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড।]

৬) রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে 'কুসংস্কার' —বোধহয় বইয়ের মূল বিষয়ের বাইরের ভাবনা। রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবে এই কুসংস্কারের জন্ম দেন নি বা তিনি চানও নি, তাঁকে ঘিরে কোনো সংস্কার / কুসংস্কার তৈরি হোক। আমরাই 'ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ'-কে দেখতে শান্তিনিকেতনে দৌড়ই, রবীন্দ্রনাথ এই করেছেন, তিনি ওই বলেছেন — এই বলে নাচানাচি করি, আমরা এই সংস্কারে বেঁচে থাকি। তাঁর প্রতি এইভাবে সম্মান প্রদর্শনের প্রচেষ্টায় আমরা হয়তো তাঁকে অবজ্ঞা করছি, তাঁর লেখা থেকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত করে চলেছি, তাঁকে যে অসম্মান করে যাচ্ছি প্রতিনিয়ত — এ কথা আমরা বুঝি না বা বুঝেও বুঝতে চাই না। এই ভাবনা শুধু যে আমার একার তা নয়, অনেকেই এই ধারণা পোষণ করেন, যেমন —শ্রী অমল হোম, যাঁকে আমরা রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের কাজের সঙ্গী এবং অন্যতম রবীন্দ্র-অনুরাগী হিসাবে জানি, তিনি ২৭ বৈশাখ ১৩৯২ মহাজাতিসদনে অনুষ্ঠিত নিখিল-বঙ্গ-রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশনের বক্তৃতায় বলেন, '... এ-সব উৎসবে শুধু নৃত্য, গীত আর অভিনয়ের মাধ্যমে তাঁর যে পরিচয় ফুটে ওঠে —তাঁর যে খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ রূপ প্রকাশিত হয় — তাতে তাঁর পরিপূর্ণ রূপের অভিব্যক্তির, তাঁর সৃষ্টির সামগ্রিক উপলব্ধির পথে ব্যাঘাত সৃষ্টি

করে বলেই আমি মনে করি। ... আপনারা আমার অপরাধ নেবেন না —আমি না বলে পারছি না —যে এইভাবে রবীন্দ্র-জয়ন্তী আজ রবীন্দ্র-বারোয়ারিতে পরিণত হতে চলেছে। ...লঘুতা, চপলতা, বাচালতা হয়ে দাঁড়িয়েছে বেশি জায়গাতেই তার বিশিষ্ট লক্ষণ।" [অমল হোম, 'পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ' (এম সি সরকার, কলকাতা, ফাল্গুন ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ)।]

৭) রবীন্দ্রনাথ 'স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা' নিয়ে কী ভেবেছেন সেই বিষয় নিয়ে একটা বিভাগ থাকলে ভাল হতো। স্ত্রী শিক্ষা, তখন তো বটেই, বর্তমানেও এটা সমাজের অন্যতম প্রধান কুসংস্কার। এই প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত গল্প 'ল্যাবরেটরি' মনে পড়ে যায়। প্রধান চরিত্র নন্দকিশোর তাঁর স্ত্রীকে শিক্ষিত করার জন্য যখন উঠেপড়ে লেগেছেন, তখন লোকে জিজ্ঞেস করত, 'ও কি প্রোফেসারি করতে যাবে নাকি।' নন্দ বলতেন, 'মা ওকে নন্দকিশোরি করতে হবে, সেটা যে-সে মেয়ের কাজ নয়।' বলত, 'আমি অসবর্ণবিবাহ পছন্দ করি নে।' 'সে কি হে।' 'স্বামী হবে এঞ্জিনিয়ার আর স্ত্রী হবে কোটনা-কুটনী, এটা মানবধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। ঘরে ঘরে দেখতে পাই দুই আলাদা আলাদা জাতে গাঁটছড়া বাঁধা, আমি জাত মিলিয়ে নিচ্ছি। পতিব্রতা স্ত্রী চাও যদি, আগে ব্রতের মিল করাও।'

৮) রবীন্দ্রনাথের একটা মন্তব্য আমাদের ভাবায় : 'সাধারণের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, সায়ান্সে ডিগ্রী-ধারী পণ্ডিত এদেশে বিস্তর আছে যাদের মনের মধ্যে সায়ান্সের জমিনটা তলতলে : তাড়াতাড়ি যা-তা বিশ্বাস করতে অসাধারণ আগ্রহ, মেকি সায়ান্সের মন্ত্র পড়িয়ে অন্ধ সংস্কারকে তারা সায়ান্সের জাতে তুলতে কুণ্ঠিত হয় না। অর্থাৎ শিক্ষার নৌকাতে বিলিতি দাঁড় বসিয়েছি, হাল লাগিয়েছি, দেখতে হয়েছে ভাল, কিন্তু সমস্ত নদীটার স্রোত উল্টো দিকে —নৌকো পিছিয়ে পড়ে আপনিই।' ['শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ', রবীন্দ্ররচনাবলী (জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) একাদশ খণ্ড।] এলেন যার বিশ্বাস, তিনি যখন প্ল্যানচেটে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন (!), তখন তিনি হয়তো এটার পেছনে মানসিক ভাবাবেগ ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধের কথা ভেবেছিলেন। আসলে রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমাত্রিক মানুষকে কোনো বিশেষ মাত্রায় ফেলে বিচার করাটা বোধহয় ঠিক নয়। তাঁর ভাষায় বলা যেতে পারে, 'আমরা তাহার কতকগুলো কাজের টুকরা এখান ওখান হইতে কুড়াইয়া জোড়া দিয়া একটা জীবন-চরিত খাড়া করিয়া তুলি, কিন্তু তাহার সমগ্রটি ত দেখিতে পাইনা।' 'আত্মা', রবীন্দ্ররচনাবলী (জনশতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ) চতুর্দশ খণ্ড। ঘটনা সকলের আঙ্গিক ও পরিপ্রেক্ষিত জানা ও বোঝা জরুরি।

সবশেষে লেখককে ধন্যবাদ জানাই তাঁর এই লেখার জন্য।

উমা

গ্রীসের ঝড়ে

অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনছি গ্রীসে খুব করেছে মেঘ
আকাশ কালো — সবারই উদ্বেগ,
থমথমে সব মেঘ ডাকে কড়কড়
এই বুঝি ভাই নামল ভীষণ ঝড়!
গ্রীসটা কোথায়? আইডিয়া নেই বেশ
সাত সমুদ্র পারের কোন এক দেশ,
কিন্তু ওতে তোমার কি দরকার?
মেজদা কেশে বলল তো এইবার —
'দরকারটা একটু আছে ভাই
এখান থেকেই ওখানকার আবহাওয়া টের পাই,
গ্রীসে এখন মেঘ করেছে বলে
এইখানেতে গঙ্গা নদীর জল উঠেছে ফুলে।
জলস্ফীতি নয়কো ভায়া দেখছ পরিণাম
সব জিনিসের হু হু করে বাড়ছে কেমন দাম,
অর্থনীতির জটিল শাস্ত্র বুঝলে বাছাধন
একেই বলে খোলাবাজার সঠিক বিশ্বায়ন।

উমা

উৎস মানুষ পত্রিকা ও বই পেতে যোগাযোগ করুন
দীপক কুণ্ডু
২৯/৩ শ্রী গোপাল মল্লিক লেন
কলকাতা - ৭০০০১২
(কর্পোরেশন অফিসের পাশের গলি)
ফোন নং - ৯৮৩০২৩৩৯৫৫

পুস্তক তালিকা

১. বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান (১) সংকলন	৩৫.০০
২. যে গল্পের শেষ নেই দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	৪০.০০
৩. বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ (৫ম প্রকাশ) সংকলন	৪২.০০
৪. প্রেসিডেন্ট বুশ-এর এই যুদ্ধ অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত	৩০.০০
৫. তিন অবহেলিত জ্যোতিষ্ক (১ম) রণতোষ চক্রবর্তী	১৮.০০
৬. বাংলা বন্‌ধ বা শেষের শুরু হিমানীশ গোস্বামী	৪০.০০
৭. এটা কী ওটা কেন সংকলন	৫০.০০
৮. 'আমরা জমি দেই নি, দেব না'	১০.০০
৯. আয়ুর্বেদে বিজ্ঞান সংকলন	৫০.০০
১০. আরজ আলী মাতুব্বর ভবানীপ্রসাদ সাহু	২০.০০
১১. প্রতিরোধ: অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত (৩য়)	৬০.০০
১২. বিবেকানন্দ অন্য চোখে/ সমীক্ষা ও আরো কিছু বিতর্ক	১০০.০০
১৩. শেকল ভাঙা সংস্কৃতি	৬০.০০
১৪. প্রমিথিউসের পথে	৩৫.০০

ওয়েবসাইট : **www.utsamanush.com** ই-মেল : **utsamanush1980@gmail.com**

যোগাযোগ ও কার্যালয় : খাদিমস বিদ্যাকুট আবাসন বি ৪ ও ৫, এস-৩, নারায়ণপুর
পোঃ (আর) গোপালপুর কলকাতা - ৭০০১৩৬

ফোন: ৯৮৩০৬৫৯০৫৮/৯৪৩৩৮৮৮৮৬২/৯৮৩১৪৬১৪৫৬

প্রাপ্তিস্থান: দীপক কুণ্ডু, ২৯/ ৩, শ্রী গোপাল মল্লিক লেন, কলকাতা-১২, বই-চিত্র (কফি হাউসের তিন তলা), পাতিরাম, বুক মার্ক, অমর কোলে (বিবাদী বাগ), দিলীপ মজুমদার (ডেকার্স লেন), সুনীল কর (উল্টোডাঙা), কল্যাণ ঘোষ (রাসবিহারী মোড়), সৈকত প্রকাশন (আগরতলা), র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন (বেনিয়াটোলা লেন, কলেজ স্ট্রীট), মনীষা গ্রন্থালয় (কলেজ স্ট্রীট)।